ইসলাম শান্তির ধর্ম !

বাংলার তাগূত ও দরবারী আলেমদের মিথ্যাচারের জবাব

আত-তামকীন মিডিয়া

ইসলাম শান্তির ধর্ম!

বাংলার তাগূত ও দরবারী আলেমদের মিথ্যাচারের জবাব

প্রথম সংস্করণ

রামাদান ১৪৩৮ হিজরি

পরিবেশনায়

আত-তামকীন মিডিয়া

সূচীপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ বা ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই, এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক মুজাহিদদের ইমাম আর সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত রাসূল মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ ﷺ এর প্রতি, এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবীগণ আর সেই সকল তাওহীদবাদী মুসলিমদের প্রতি যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার দেখিয়ে যাওয়া পথকে অনুসরণ করবেন। অতঃপর: আল্লাহ ﷻ কোরআনুল কারীমে বলেন: {বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরক্বান নাজিল করেছেন, যাতে তিনি (মুহাম্মাদ ﷺ) সৃষ্টিকুলের প্রতি সতর্ককারী হোন।} [আল-ফুরক্বান: ১]

ঈমান আর কুফরের দ্বন্দ্বের ইতিহাস দীর্ঘ, আর সেই ইতিহাসের সাক্ষী কোরআন নিজেই। আল্লাহ ﷻ যুগে যুগে ঈমান আর কুফরের দ্বন্দ্বের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করেছেন। যারা সেই পরীক্ষায় আল্লাহর অনুগ্রহে উত্তীর্ণ হয়েছে, তারাই হয়েছে সফলকাম আর যারা এই সফলতার পথ ছাড়া অন্য যে কোন পথ অনুসরণ করেছে, তারাই হয়েছে দুনিয়া আর আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। যুগে যুগে আল্লাহর ঈমানদার বান্দাগণ কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছেন, ইব্রাহীম عليه السلام-কে আল্লাহ পরীক্ষা করেছিলেন তার সম্প্রদায়ের লোকদের দ্বারা, মূসা عليه السلام এর বিরুদ্ধে ফেরাউনের সীমালঙ্ঘন আমাদের অজানা কোন কাহিনী নয়, তারপর আমাদের নবী মুহাম্মাদ ﷺ, তরবারি উঁচিয়ে মুজাহিদদের কাফিলা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে যাকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা একমাত্র ঈমান আনার কারণেই তার ভূমি থেকে বিতাড়িত করেছিল, তার অনুসারীগণদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল, দিয়েছিল মিথ্যা অপবাদ। যুগে যুগে হকের অনুসরণকারীদের উদাহরণ ঠিক এমনই, এমনই আল্লাহর রীতি, {আর আপনি আল্লাহর রীতিতে পরিবর্তন পাবেন না।} [আল-আহযাব: ৬২] আল্লাহর সেই রীতি সমূহের একটি হলো আল্লাহর ঈমানদার বান্দাদের প্রতি তার সাহায্য আর বিজয়ের প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ ﷻ বলেন, {এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।} [আস-সাফ: ১৩]

হ্যাঁ, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। তিনি তার বান্দাদের বিজয় দান করেন। আর সেই বিজয় আসে বিভিন্ন রাস্তায় বিভিন্ন অর্থে। কখনও আল্লাহ বিজয়কে মানুষের চর্মচক্ষুর

সামনে অনাবৃত করে দেন, সেই বিজয়কে ভালো-মন্দ, মুসলিম-কাফির নির্বিশেষে সবাই দেখতে পারে, যাতে মুমিনদের হৃদয় আনন্দিত হয় আর মুনাফিক-মুশরিকদের হৃদয়ে ক্রোধের আগুন জ্বলে। যেমনটা হয়েছে আল্লাহর বিস্তৃত ভূমিতে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বছরের পর বছর দুঃখ-দুর্দশা আর কঠিন পরীক্ষার সামনে আল্লাহর অনুগ্রহ আর তাওফিকে অবিচল থাকা ইরাক আর শামের মুজাহিদগণের সামনে আল্লাহ বিজয়ের দরজা খুলে দেন। সে ইতিহাস অনেকেরই জানা, আর যাদের জানা নেই তাদের জন্যও জেনে নেয়াটা খুব কঠিন কোন বিষয় বলে আমরা মনে করি না, তাই আমরা এই বিষয়টিকে এখানে দীর্ঘায়িত করবো না। পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে আল্লাহর বিজয় আসে বিভিন্ন পথে আর বিভিন্ন অর্থে। কোন বিজয়কে সবাই উপলব্ধি করে আর কোন বিজয়কে একমাত্র সেই হৃদয়ই উপলব্ধি করতে পারে যাকে আল্লাহ ﷻ তাঁর অশেষ অনুগ্রহে অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন। আল্লাহ আমাদের হৃদয়কে তাঁর অনুগ্রহে, একমাত্র তাঁরই কৃপায় হিদায়াহ দান করুন।

দুঃখ-দুর্যোগে জর্জরিত এই পৃথিবীর বুকে খিলাফাহ নামক আশার সূর্যের উদয় হওয়ার সাথে সাথে তার আলো ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিস্তৃত ভূমিতে। আল্লাহর অনুগ্রহে সহীহ ফিতরতের উপর টিকে থাকা হৃদয়গুলো সেই আলোর স্পর্শে নতুন জীবন ফিরে পায়। বাংলার জমিনও আল্লাহর সেই অনুগ্রহ থেকে বাদ পড়েনি। তাইতো উম্মতের এই অংশের মধ্য থেকে সর্বোত্তম চরিত্র আর সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত যুবকরা আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের ﷺ ডাকে সাড়া দেয়। আল্লাহ ﷻ পবিত্র কোরআনে বলেন, {হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও! যখন তারা তোমাদের এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবে।} [আল-আনফাল: ২৪] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে ইসহাক رحمه الله বলেন, "(এই আয়াতের) ভাবার্থ হচ্ছে – যখন নবী ﷺ তোমাদের সেই যুদ্ধের দিকে আহ্বান করেন যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের মর্যাদাশীল করেছেন, অথচ এর পূর্বে তোমরা অপদস্থ অবস্থায় ছিলে। তোমরা দুর্বল ছিলে তিনি তোমাদের শক্তিশালী করেছেন এবং তোমরা কাফিরদের কাছে পরাজিত হয়েছিলে, যার পর তিনি তোমাদের তাদের উপর বিজয় দান করেছেন, তখন তোমরা তাড়াতাড়ি তাঁর ডাকে সাড়া দাও এবং হুকুম পালন কর।" [তাফসির আত-তাবারী]

বাংলার সত্যবাদী মর্দে মুজাহিদগণ সেই ডাকেরই সাড়া দেন, তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আদেশ অনুসারে কাফির-মুশরিক-মুরতাদ নির্বিশেষে কুফরের সকল দল-মতের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ শুরু করেন। সেই জিহাদের সূত্রপাতই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা প্রথম বিজয়, কিন্তু হয়তবা অধিকাংশ হৃদয়ই তা উপলব্ধি করতে পারে

নি। বাংলার মুসলিমদের ঘাড়ে শকুনের মতো চেপে বসা মুরতাদ তাগূত সরকারের গদী নড়ে উঠে। বাংলার তাগূত সরকারের প্রতিক্রিয়া ছিল পূর্ব-প্রত্যাশিত। মুজাহিদগণের দুর্বলতা আর সংখ্যা স্বল্পতা আল্লাহর দুশমনদের ধোঁকা গ্রস্থ করেছিল, তাইতো তারা গর্বভরে তাদের তাগূতি মিডিয়াতে মুনাফিকদের আশ্বাস প্রদান করেছে যে তারা তাদের ইহুদী-নাসারা আর হিন্দু প্রভুদের দয়া দাক্ষিণ্যে পাওয়া শক্তি সরঞ্জাম দ্বারা এই ছোট মুজাহিদ দলকে উড়িয়ে দিবে, কিন্তু {শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। } [আন-নিসা: ১২০] এবং {... শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল} [আন-নিসা: ৭৬] মুরতাদদের তীব্র অভিযান মুজাহিদগণের ধৈর্য ও দৃঢ়তা বাড়িয়ে দেয়, আল্লাহ তাদের সহায় হোন।

যাই হোক, বিজয়ের কথা বলছিলাম। বাংলা জমিনে মুজাহিদগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে আরেক বিজয় প্রত্যক্ষ করেছেন, হয়তোবা অধিকাংশ হৃদয়ই তা উপলব্ধি করে নি। বাংলার তাগূত সরকার তাদের শক্তি আর জনবলের দ্বারা যে স্বপ্ন দেখছিল, তাদের সেই স্বপ্ন সত্যি হয় নি, বরং দুঃস্বপ্নেই পরিণত হয়েছে। মুজাহিদগণের ঈমান-দৃঢ়তা আর সামরিক প্রতিরোধ মুরতাদদের তাদের বাহুবলের দাম্ভিকতা থেকে কানে ধরে টেনে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। তাইতো তারা নতুন অস্ত্র খুঁজতে শুরু করেছে। আর যখনই আল্লাহর দুশমনরা কোন বিপদে পতিত হয়ে সাহায্যের আহ্বান করে তখন বরাবরের মতই কুফরের ইমাম নামধারী আলেম উলামারাই সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঝড়ের গতিতে সবার আগে গিয়ে তাদের দরবারে হাজির হয়। আল্লাহ ﷻ বলেন, {হে ঈমানদারগণ! আলেম ও দরবেশদের অনেকে লোকদের মালামাল অন্যায়ভাবে ভোগ করে চলছে এবং আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত রাখছে।} [আত-তাওবাহ: ৩৪] ঈমানের আলোয় আলোকিত একটি প্রজন্ম যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে সর্বাত্মক জিহাদের ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তখন বাংলার জমিনে থাকা ভুরি ভুরি শয়তান আলেমদের জন্য রুজির একটি নতুন পথ খুলেছে, কতই না নিকৃষ্ট সেই রুজি! শয়তান আলেমদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, কে কার আগে তার প্রভুকে খুশি করতে পারে, হয়তো এতে তারা তাগূতের ফেলে দেয়া ঝুটা খাবারের কিছু অংশ লাভ করবে। আল্লাহ এই শয়তান আলেমদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিন। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যেমনটা বরাবরের মতই হয়ে থাকে। ফিরাউনকে তার মোল্লা-মুরব্বিরা বলেছিল {মুসা আর তার সম্প্রদায়কে তুমি এভাবেই ভূমিতে ফাসাদ সৃষ্টি করা আর তোমাকে ও তুমি যাদের ইবাদত কর তাদের বাতিল করার জন্য ছেড়ে দিবে?} [আল-আরাফ: ১২৭] সুবহানাল্লাহ! মুসা ﷺ কে আর ফিরাউন কে তা সবারই জানা। মুসা ﷺ ছিলেন আল্লাহর রাসূল, যিনি মানুষকে ঈমান আনতে আর ফিরাউনের সাথে যুদ্ধ করতে

আহ্বান করেছিলেন। একেই তারা “ফাসাদ” বলে অভিযুক্ত করেছিল। বর্তমান নামধারী সরকারী আলেমরা তাদের পূর্বপুরুষদেরই পথ বেছে নিয়েছে।

ইসলাম-মুসলিম আর জিহাদের বিরুদ্ধে সামরিক যুদ্ধের সাথে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের রশদ সরবরাহ করার জন্য তাগূতের ভাড়াটে মিডিয়া কাজ করে আসছে যুগ যুগ ধরে। পূর্বে বাংলার তাগূতী মিডিয়া মূলত আন্তর্জাতিক কুফরি মিডিয়ার অনুসরণ-অনুকরণ করেই তাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে ধরে নিত। জিহাদ এবং মুজাহিদদের বাস্তবতাকে মানুষের কাছে বিকৃত করে উপস্থাপন করার জন্য আন্তর্জাতিক কুফরি মিডিয়ার গাঁজাখুরি গল্প আর আজগুবি সব কাহিনী অনুবাদ করে তারা তাদের পত্রিকা বা ওয়েব সাইটে বিশাল আকার দিয়ে প্রচার করত। কিন্তু বাংলা জমিনে জিহাদের সূত্রপাত দৃষ্টিভ্রম সৃষ্টি করে। তারা উপলব্ধি করতে পারে যে তাদের এই গাঁজাখুরি কাহিনীগুলো আর কাজে দিচ্ছে না। তাই তো তারা তাগূত সরকারের গোলাম মুরতাদ বাহিনীর সাথে যোগসাজশ করে এমন এক নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা তারা পূর্বে করে নি। সাম্প্রতিক তারা ব্যাপক ঢাক-ঢোল বাজিয়ে “কতিপয় বিষয়ে জঙ্গিবাদীদের অপব্যাখ্যা এবং পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা” নামে একটি কিতাব প্রকাশ করে। কিতাবে তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে ইসলামকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিপথে পরিচালিত করতে পারে না।

সামগ্রিক জিহাদের ময়দানে মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ের ভূমিকা ব্যাপক। আমরা আমাদের এই কিতাবের বিষয়বস্তুতে মনোযোগ দেয়ার স্বার্থে সেই বিস্তারিত আলোচনায় যাব না। তদুপরি জিহাদের ময়দানে আল্লাহর দুশমনরা যতবারই কোন অস্ত্র নিয়ে আসছে আল্লাহ তাঁর মুজাহিদ বান্দাদের দ্বারা সেই অস্ত্রকে অকেজো করে দিয়েছেন, কারণ মুজাহিদগণ ইতিহাস জুড়েই তাগূতের জন্য গলার কাটা হয়ে ছিলেন এবং এখনও আছেন, আর ভবিষ্যতেও থাকবেন ইনশাআল্লাহ। মিথ্যা হলো শীতের সকালে কুয়াশার মত, সূর্যের আলোর স্পর্শে যার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। সত্যের সামনে মিথ্যাকে বিপন্ন হতেই হবে। আল্লাহ ﷻ বলেন, {বরং আমরা সত্যকে মিথ্যার উপর নিক্ষেপ করি, অতঃপর সত্য মিথ্যার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়, অতঃপর মিথ্যা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।} [আল-আম্বিয়া: ১৮] মিথ্যা সর্বোচ্চ যা করতে পারে তা হলো মানুষকে সাময়িক ভাবে বিভ্রান্ত করা, তদুপরি যখনই সত্যের দলীল প্রমাণ এসে উপস্থিত হয় তখনই মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল, যারা সত্যান্বেষী, তারা নির্দ্বিধায় সত্যকে মেনে নেয় এবং আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে আর আরেকদল, যাদের হৃদয় রোগাক্রান্ত, তারা নতুন

কোন সংশয় খুঁজতে শুরু করে, যাতে দুনিয়াতে তাদের স্বার্থ সিদ্ধি হয়।

তাগূতের এই কিতাবটি প্রথমবার আমাদের কাছে পৌঁছার সাথে সাথেই আমরা সিদ্ধান্ত নেই আমরা এই কিতাবে শয়তান আলেমদের দ্বারা সৃষ্ট সংশয়গুলোর দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দিয়ে একটি কিতাব প্রকাশ করবো, এ কাজে আল্লাহই আমাদের সহায় এবং আমরা তাঁর কাছেই সফলতার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ যেন আমাদের কাজে বরকত দান করেন এবং এই কিতাবকে সত্যান্বেষী হৃদয়ের জন্য আলোর পথ আর কাফির-মুরতাদদের হৃদয়ে জ্বালা-যন্ত্রণার আসবাব বানিয়ে দেন। আমিন।

এই কিতাবের প্রধান উদ্দেশ্য তাদের সংশয়ের জবাব দেয়া হলেও আমরা কিতাবটিকে একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিকে সাজাবো। আমরা তাদের সূচিপত্র অনুসারে লাইন বাই লাইন বিশ্লেষণ করবো না, কারণ আমরা তাদের সূচিপত্র অনুসরণ করতে বাধ্য নই। তাছাড়া, কিতাবটি পড়ে আমরা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করেছি এই কিতাব তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যর্থ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। কিতাবটির বিষয়াদিও অগোছালো এলোমেলো। তাই আমরা কিতাবটিকে অধিক বোধগম্য করার জন্য এবং পাঠকদের জন্য অধিক ফায়দাজনক করার জন্য বিষয়গুলোকে গুরুত্ব অনুসারে ক্রমান্বয়ে সাজিয়েছি। আমাদের কিতাবে যেখানেই আমরা তাদের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেছি তখন সেই অংশকে আমরা *ইটালিক* করে দিয়েছি, যাতে পাঠকদের বুঝতে সুবিধা হয় কোনটি মুজাহিদদের বক্তব্য আর কোনটি তাগূতের বক্তব্য আর সত্যের সাথে মিথ্যা যাতে মিশ্রিত না হয়। কিতাবে তাদের সৃষ্ট সংশয়গুলোর জবাব থাকবে ইনশাআল্লাহ, তদুপরি এই কিতাব শুধু মাত্র তাদের সংশয়ের জবাবের কিতাব নয়, বরং এর মধ্যে আমরা আরও দ্বীনি কিছু বিষয় যুক্ত করবো যা আমাদের পাঠকদের সঠিক আক্বিদাহ এবং মানহাযকে বুঝতে এবং ভবিষ্যতে যদি আল্লাহর শত্রুরা নতুন কোন সন্দেহ সংশয়ের উদ্ভব ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে সেক্ষেত্রে হক বুঝতে সাহায্য করবে বলে আমরা আশা করি। তদুপরি যেহেতু এই কিতাবের প্রধান লক্ষ্য হলো মুরতাদদের লিখা কিতাবের মিথ্যাচারকে সাধারণ সত্য অন্বেষণকারী মুসলিমদের কাছে পরিষ্কার করা তাই আমরা কোন বিশেষ টপিক নিয়ে অতিরিক্ত বিস্তারিত লিখবো না, কারণ তারা তাদের কিতাবে ইসলামের এমন অনেক বিষয় নিয়ে নির্লজ্জ মিথ্যাচার করেছে যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। সেই সকল ক্ষেত্রে আমরা সংক্ষেপে তাদের মিথ্যাচারকে তুলে ধরে তার জবাব দেব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ ﷻ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে একমাত্র তাঁরই রাহে খালিস আমল হিসেবে গ্রহণ করুন এবং আমাদের গোনাহ ক্ষমা করার আসবাব বানিয়ে দিন। আমিন।

কোরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যার উৎস

কিতাবটির শুরুতেই আমরা বলেছি যে এই কিতাবটিকে আমরা বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে ক্রমান্বয়ে সাজাবো। সে হিসেবে কোরআন এবং সুন্নাহের ব্যাখ্যার উৎস সম্পর্কে জানা সবচেয়ে জরুরি। এ ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ'র মতামত হলো কোরআন ও সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের ইসলামের আবির্ভাব হওয়ার প্রথম তিন প্রজন্মকে অনুসরণ করতে হবে। এই কারণে আরবিতে এই তিন প্রজন্মকে বলা হয় "قرون المفضلة" বা "ফজিলতপূর্ণ প্রজন্ম সমূহ"। ইমরান ইবনে হুসাইন ﵁ সূত্রে বর্ণিত হাদিসে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো আমার প্রজন্ম (অর্থাৎ সাহাবীগণ), তারপর তাদের পরে যারা আসবে এবং তারপর যারা আসবে।" ইমরান ﵁ এর পর বলেন, "রাসূল ﷺ তার পর দুই প্রজন্মের কথা উল্লেখ করেছেন না তিন প্রজন্মের কথা সেটা আমার মনে নেই।" [সহীহ আল-বুখারী] তাছাড়া সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ﵁ হতে বর্ণিত একই মর্মের আরেকটি হাদিস আছে যেখানে তিনি তিনটি প্রজন্মের কথা উল্লেখ করেন। এই তিন প্রজন্মের মধ্যে সর্ব প্রথম এবং সর্বোত্তম প্রজন্ম হলেন আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সাহাবীগণ। যাদের ফজিলত সম্পর্কে আল্লাহ ﷻ কোরআনুল কারীমে একাধিক আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন: {সর্ব প্রথম হিজরতকারী এবং আনসারদের মধ্যে অগ্রগামীগণ, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সেই সমস্ত লোকদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান সফলতা।} [আত-তাওবাহ: ১০০]

আবদুল্লাহ ইবনে উমার ﵄ এর সূত্রে অপর একটি বিখ্যাত হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "নিশ্চয়ই বনী ইসরাইল বাহাত্তরটি ফিরকায় বিভক্ত হয়েছে, এবং আমার উম্মতরা বিভক্ত হবে তেহাত্তর ফিরকায়। একটি ফিরকা ছাড়া বাকি সবাই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" তিনি বলেন "সেই ফিরকাটি কারা, ইয়া রাসূলুল্লাহ।" তিনি ﷺ বলেন: "যারা আমার আর আমার সাহাবীদের অনুসরণ করবে।" [আত-তিরমিজী; "আহকামুল কোরআনে" ইবনুল আরাবি এই হাদিসকে হাসান বলে সাব্যস্ত করেছেন।]

তাদের অনুসরণের কারণ হলো: তারা হচ্ছেন সেই প্রজন্ম যাদের ফজিলত কোরআন এবং হাদিসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত, কোরআন নাজিল হয়েছে তাদের সম-সাময়িক ভাষায়। তাছাড়া সাহাবীগণকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে দ্বীনের শিক্ষা

প্রদান করেছেন এবং কোরআন নাজিলের ঘটনা প্রবাহ সমূহ তারা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর পরবর্তী দুই প্রজন্মের তারবিয়্যাত হয়েছে সাহাবীগণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে।

প্রথম তিন প্রজন্ম সমূহের কাছ থেকে দ্বীনের ব্যাখ্যা নেওয়ার পিছনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি কারণ হলো তাদের সময় ইসলাম বিজয়ী অবস্থায় ছিলো। তারা তৎকালীন খিলাফাহ'র ছায়ায় জীবন যাপন করেছেন। তারা স্বাধীনভাবে কোরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন এবং প্রচার করতে পেরেছেন। বর্তমান বিশ্বের মুরতাদ তাগূত সরকারের অধীনে থাকা মুসলিম ভূমি সমূহে যা সম্ভব নয়। বর্তমানে তাগূতেরা নাম সর্বস্ব ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে তাদের নিজেদের মতলব অর্জনের জন্য কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ সবই তারা নিয়ন্ত্রণ করে। এই সকল নজরদারির মধ্যেও যখন আল্লাহর মুখলিস কোন আলেম বান্দা হকের দাওয়াত প্রদান করার চেষ্টা করেন তখন তারা তাকে জেল-গ্রেফতার দ্বারা হয়রানি করে। আর যদি তাতেও তারা ভীত সন্ত্রস্ত না হয়ে তাদের দাওয়াত চালিয়ে যান সেক্ষেত্রে তারা তাকে হত্যা করে বা গুম করে দেয়। এই বাস্তবতা সমূহ অন্ধ-বধির ছাড়া সবারই জানা। বাংলার ভূমি সহ অন্যান্য ভূমি সমূহে তাগূতের কারাগারগুলো মুজাহিদ আলেম আর তালিবুল ইলমদের দ্বারা পরিপূর্ণ। অপরদিকে, তাগূতের ভাড়াটে মিডিয়াগুলো মানুষকে গোমরাহ বানানোর জন্য তাদের পক্ষের জ্ঞানের গর্দভদের বড় বড় আলেম খেতাব দিয়ে প্রচার প্রচারণা করে।

কোরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করার জন্য হকপন্থী উলামাদের অনুসরণ করাও অতিব জরুরি বিষয়। কারণ যুগে যুগে তারা অক্লান্ত প্ররিশ্রম আর মেহনতের মাধ্যমে তাওহীদের দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন – আল্লাহ তাদের উপর রহম করুন। আল্লাহ ﷻ কোরআনুল কারীমের বলেন: {আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাময়।} [ফাত্বির: ২৮] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির রহিমাহুল্লাহ তার তাফসির গ্রন্থে বলেন: "এরপর আল্লাহ বলেন: আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আলেম তারাই তাঁকে ভয় করে। কারণ তারা জানে ও বুঝে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি যত বেশি আল্লাহ সম্বন্ধে অবগত হবে ততই সে মহান শক্তিশালী ও সর্বজ্ঞানী আল্লাহর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হবে এবং তার অন্তরে তাঁর ভয় তত বেশী হবে। যে জানবে যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান সে পদে পদে তাঁকে বেশি ভয় করবে। হাসান বাসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন: 'আলেম তাকেই বলে যে আল্লাহকে না দেখেই তাঁকে ভয় করে এবং তাঁর সন্তুষ্টির কাজে আগ্রহ প্রকাশ করে ও তাঁর অসন্তুষ্টির কাজকে ঘৃণা করে এবং তা

হতে বিরত থাকে।' ইবনে মাসউদ (রা) বলেন: 'কথা বেশি বলার নাম ইলম নয়, বরং ইলম বলা হয় আল্লাহকে অধিক ভয় করাকে।' ইমাম মালিক ﵀ এর উক্তি: 'অধিক রিওয়াত বর্ণনা করান নাম ইলম নয়, বরং ইলম একটা জ্যোতি যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দার অন্তরে ঢেলে দেন।'" উলামা বলতে প্রথম প্রজন্মের মুসলিম তাদেরকেই বুঝতেন যারা আল্লাহকে বেশি ভয় করে। যাদের কর্মকাণ্ডে আল্লাহর ভয় প্রকাশ পায়। তাদের কেউই উলামা হওয়া শর্ত হিসেবে তাগূতের অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট পাওয়াকে উল্লেখ করেন নি।

চলুন আমরা এখন দেখি এই ব্যাপারে আমাদের আলোচ্য কিতাবটিতে তারা কি লিখেছে: *"উগ্রবাদী গ্রুপের লোকেরা অনেক ধরণের কিতাব-পুস্তক ব্যবহার করে তাদের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে কিছু থাকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি সংবলিত খিলাফত, ইসলামী রাষ্ট্র ও জিহাদ সংক্রান্ত পুস্তক। এগুলোতে তারা শাসন, বিচার ও জিহাদ বিষয়ক আয়াতগুলোর শানে নুযূল ও প্রাসঙ্গিক বিবেচনা উল্লেখ ব্যতিরেকে একপেশে, খণ্ডিত অথবা অগ্রহণযোগ্য তাফসীর কিংবা মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সাজায়। এরপর খুব সংগোপনে টার্গেট নিয়ে সরল-সহজ ছেলে-মেয়েদেরকে বিকৃতভাবে জিহাদের নামে জঙ্গিবাদ দীক্ষা দেয়। জিহাদ-শাহাদাত-খিলাফত-জান্নাত ইত্যাদি বিষয়গুলোর বিকৃত ব্যাখ্যা পড়িয়ে, শিখিয়ে, বুঝিয়ে কিশোর-তরুণদের বিপথগামী করে। কখনো কখনো কুরআনের আয়াত, হাদিস বা সীরাতের একটি সাময়িক বিধান বা বিচ্ছিন্ন অংশ বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ নির্দেশনা উল্লেখ করে অথবা আয়াত-হাদীসের একাংশ ব্যবহার করে এবং অন্য অংশ গোপন করে তাদের টার্গেট অনুযায়ী সদস্যদের মগজ ধোলাই করে।*

একাডেমিকভাবে প্রকৃত আলেম, স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত উস্তাদদের সান্নিধ্য না থাকা এবং এদের ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও দর্শনে যথাযোগ্য পাঠ এবং ব্যাপক ধারণার অভাবে এরা নিজেরাই ভুল পথে চলেছে এবং বিভিন্ন পরিবার থেকে ভাগিয়ে নেয়া তরুণ-তরুণীদেরকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ... তাই বলা যায়, কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যা সর্বগ্রাহ্য আলেমের দীন থেকে গ্রহণ করা উচিত।" [পৃষ্ঠা ৪] এখানে তাদের সব বক্তব্যই মনগড়া। আল্লাহ ﷻ কোরআনুল কারীমের বলেন: {বলে দাও (হে মুহাম্মাদ): তোমরা সত্যবাদী হলে, দলীল-প্রমাণ নিয়ে আসো।} [আল-বাক্বারাহ: ১১১] তারা যে "একাডেমিক" বা "প্রাতিষ্ঠানিক" শিক্ষা আর সার্টিফিকেট ছাড়া আলিম হওয়া যাবে না, সেই দাবীর পক্ষে দলীল তারা কিয়ামত পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারবে না। তাছাড়া তারা দাবি করেছে যে *"এগুলোতে তারা শাসন, বিচার ও জিহাদ বিষয়ক*

আয়াতগুলোর শানে নুযূল ও প্রাসঙ্গিক বিবেচনা উল্লেখ ব্যতিরেকে একপেশে, খণ্ডিত অথবা অগ্রহণযোগ্য তাফসীর কিংবা মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে সাজায়।" তাদের এই কিতাবের বিশ্লেষণের সময় প্রমাণিত হবে যে কারা আসলে "শানে নুযূল ও প্রাসঙ্গিক বিবেচনা উল্লেখ ব্যতিরেকে একপেশে, খণ্ডিত অথবা অগ্রহণযোগ্য তাফসীর কিংবা মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে" আর কারা "আয়াত-হাদীসের একাংশ ব্যবহার করে এবং অন্য অংশ গোপন করে" ইনশাআল্লাহ।

তদুপরি, তাগূতের "একাডেমিক" সার্টিফিকেটধারী উলামাদের অনুসরণ করার জন্য সরকারী সংস্থাগুলোর বিজ্ঞাপনে মোটেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ তারা ভালো করেই জানে যে এই আলেমরা তাদের একনিষ্ঠ খাদেম। এই আলেমরা মানুষকে ঠিক তাই শিক্ষা দিবে যা সরকারের অনুকূলে যায়। এমনকি জুমার খুতবায় মিম্বারে দাড়িয়ে তারা যে বক্তব্য প্রদান করে তাও আসে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কলম থেকে। তারা আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার আর স্থানীয় মুরতাদ সরকারদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে বিজয়ী করার জন্য সব কিছু করছে। পৃথিবীর প্রতিটি কোনায় যখন মুসলিমরা কাফির-মুরতাদদের বন্দুকের নলের সামনে, যখন তাদের যুদ্ধ-বিমান সমূহ মুসলিমদের নারী-পুরুষ, বাজার-মসজিদ কিছুই বাছ-বিচার করছে না, তখন এই সরকারি আলেমদের কলম আর দুর্গন্ধযুক্ত মুখ থেকে কখনই তাদের রক্ষার করার ফতোয়া আসে না। যখনই মুজাহিদগণ ক্রুসেডার আর মুরতাদদের উপর হামলা চালান তখনই তাদের কলম ও জিহবা সক্রিয় হয়ে উঠে। আল্লাহর কোন মুজাহিদ বান্দা যেকোন সময় আল্লাহর কোরআনের সেই আয়াতের অনুসরণে করে তাকে হত্যা করতে পারেন, যে আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন, {...তবে কুফরের ইমামদের কতল কর।} [আত-তাওবাহ: ১২], এই ভয়ে তারা তাদের বিশেষ নিরাপত্তা প্রদান করে। পূর্ণিমা রাতের চাঁদ না দেখা অন্ধ আর ঝড়ের রাতের বজ্রপাত না শুনা বধির ছাড়া আর কেউই এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারবে না। তারপরও যারা অস্বীকার করবে তাদের ফয়সালা আল্লাহর হাতে।

আক্বিদাহ

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বাংলার তাগূতের এজেন্টরা "কতিপয় বিষয়ে জঙ্গিবাদীদের অপব্যাখ্যা এবং পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা" নামে যে কিতাবটি প্রকাশ করেছে তা একটি অগোছালো কিতাব। কিতাবটিতে তারা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন বিষয়কে তুলে নিয়ে এসেছে। বিষয়টা এমন নয় যে তারা কিতাবটিকে গোছালো ভাবে লিখতে পারে না, কিন্তু যখন কারও উদ্দেশ্য থাকে মানুষকে গোমরাহ করা এবং তাদের বিভ্রান্ত করা তখন অগোছালো বিষয়বস্তু অধিক কার্যকর। কিন্তু আমরা তাদের সেই ফাঁদে পা দেবনা, ইনশাআল্লাহ। কিতাবটিতে তারা আক্বিদাগত বেশ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছে। সেখানে তারা চেষ্টা করেছে মুজাহিদদের আক্বিদাকে গোমরাহ বা অসম্পূর্ণ প্রমাণ করার। কিন্তু দাওলাতুল ইসলামের তাওহীদবাদী মুসলিম মুজাহিদদের কাছে আক্বিদাহ সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের আক্বিদাহ কোরআন-সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা গোপন কোন বিষয় নয়। এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই দাওলাতুল ইসলাম তথা খিলাফাহ রাষ্ট্রের অফিসিয়াল প্রকাশনা সংস্থা "মাকতাবাহ আল-হিম্মাহ" থেকে প্রকাশিত "এই আমাদের আক্বিদাহ, এই আমাদের মানহায" নামক একটি প্যামফ্লেট এর বক্তব্যকে এখানে সরাসরি তুলে আনবো। উল্লেখ্য যে, এই প্যামফ্লেটটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে, যার মধ্যে বাংলা ভাষাও অন্তর্ভুক্ত।

দাওলাতুল ইসলামের আক্বিদাহ

আমরা পাঠকদের অনুরোধ করবো এই অংশটিকে গুরুত্বের সাথে মনোযোগ দিয়ে পড়ে নিতে। কারণ তাগূতের জ্ঞানপাপীরা মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি মিথ্যাচার করেছে, তার খণ্ডনে তা কাজে আসবে, ইনশাআল্লাহ। প্যামফ্লেটটি নিম্নরূপ:

সকল প্রশংসা আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল, তার পরিবার, তার সাহাবা এবং তার অনুসারীগণের প্রতি। অতঃপর,

● আমরা ঈমান আনি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি ছাড়া ইবাদতের হকদার কেউ নেই। তাওহীদের কালিমা যা সাব্যস্ত করে আমরা তাঁর ব্যাপারে তাই সাব্যস্ত করি এবং তাঁর সাথে আর কাউকে শরিক করি না। এভাবেই আমরা "লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ” এর উপর ঈমান আনি, একমাত্র তাঁরই উপর এবং কোন শরিক ব্যতীত, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এটাই দ্বীনের সকল বিষয়ের কেন্দ্র। যিনিই এই কালিমার ঘোষণা দেন, এর শর্তসমূহ পূরণ করেন এবং এর হক আদায় করেন তিনিই একজন মুসলিম। আর যে এর শর্তসমূহ পূরণ করতে ব্যর্থ হয় অথবা কোন ঈমান ভঙ্গকারী বক্তব্য বা কাজ করে সে একজন কাফির, এমন কি যদিও সে নিজেকে মুসলিম দাবি করে।

- আমরা এই বিষয়ে ঈমান আনি যে আল্লাহ ﷻ হলেন সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং (সকল বিষয়ের) পরিচালক, তিনি সব কিছু করতে সক্ষম, তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ, সর্বোচ্চ এবং নিকটতম। {কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন।} [আশ-শূরা: ১১] আমরা তার ﷻ এর নাম অথবা সিফাতের ব্যাপারে গোমরাহির অনুসরণ করি না। বরং, আমরা সেই বিষয় সমূহে ঠিক তেমন ভাবেই তাঁর জন্য সাব্যস্ত করি যেমনটি কিতাবুল্লাহ এবং সহীহ হাদিসে এসেছে। আমরা (তাঁর সিফাত সমূহের ব্যাপারে) এই বর্ণনা করি না যে তা “কেমন”, এর সাথে (আমরা সৃষ্টিকুলের কিছুর) তুলনা করি না, এর কোন বাতিল ব্যাখ্যা দেই না, আর কোন অর্থকেও অগ্রাহ্য করি না।

- আমরা ঈমান আনি যে মুহাম্মাদ ﷺ সমস্ত মানব এবং জ্বিন জাতির জন্য আল্লাহর প্রেরিত রসূল এবং তাকে অনুসরণ করা ফরয। তিনি যা যা আদেশ করেন তার সব কিছু অনুসরণ করা আবশ্যক এবং তিনি আমাদের যা যা অবগত করেছেন সব সত্য বলে ঘোষণা করা এবং মেনে নেয়া ফরয। {অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।} [আন নিসা: ৬৫], আমরা আল্লাহর এই আয়াতের বাস্তবায়ন করি।

- আমরা আল্লাহর সম্মানিত ফিরিস্তাগণের প্রতি ঈমান আনি এবং স্বীকার করি যে তারা আল্লাহর অবাধ্যতা করেন না এবং তাদের যা আদেশ করা হয় তারা তা সম্পাদন করেন। এবং আমরা আরও ঈমান আনি যে, তাদের ভালোবাসা ঈমানের অংশ এবং তাদের ঘৃণা করা কুফরি।

- আমরা ঈমান আনি যে, কোরআন – আক্ষরিক এবং অর্থগতভাবে – আল্লাহর ﷻ কালাম, তা আল্লাহর ﷻ সিফাত সমূহের একটি এবং তাঁর সৃষ্টি (মাখলুক) নয়। সেহেতু

একে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা, এর অনুসরণ করা এবং বিধানকে বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব।

● আমরা আল্লাহর ﷻ সকল নবী এবং রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনি, যাদের প্রথম হলেন আদম عليه السلام এবং শেষ মুহাম্মাদ ﷺ, তারা পরস্পর প্রিয় এবং ভাই-ভাই। তাদের আল্লাহর ﷻ তাওহীদের রিসালাহ সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে।

● আমরা ঈমান আনি যে, সুন্নাহ হলো ওহীর দ্বিতীয় প্রকার এবং তা কোরআনকে ব্যাখ্যা করে এবং এর অর্থকে পরিষ্কার করে। আমরা কোন সহীহ হাদিসের উপর অন্য কারো কথাকে প্রাধান্য দেই না, সে যেই হোক না কেন, এবং আমরা ছোট-বড় সকল প্রকার বিদাআতকে বর্জন করি।

● আমাদের নবী ﷺ কে ভালোবাসা ওয়াজিব এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি পন্থা। তাকে ঘৃণা করা কুফর এবং নিফাক্ব। এবং আমাদের নবী ﷺ এর প্রতি আমাদের ভালোবাসার কারণেই আমরা তার পরিবার অর্থাৎ “আহলুল বাইত” এর সদস্যদের ভালোবাসি। আমরা তাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করি, কিন্তু তাদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করি না, আমরা তাদের কোন অপবাদও দেই না... আমরা আল্লাহর কাছে এই মর্মে দোয়া করি যে, তিনি যেন সকল সাহাবার প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং আমরা তাদের প্রত্যেককে বিশ্বাসযোগ্য বলে সাব্যস্ত করি, আমরা তাদের ব্যাপারে শুধু উত্তম কথাই বলি। তাদের ভালোবাসা আমাদের কাছে ওয়াজিব এবং তাদের ঘৃণা করা নিফাক্ব। তাদের নিজের মধ্যে সংঘটিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমরা নীরবতা পালন করি কারণ তারা তাদের নিজেদের তাউয়িলের (ব্যাখ্যা) অনুসরণ করেছেন এবং তারা ছিলেন সর্বোত্তম প্রজন্ম।

● আমরা ক্বদর এবং এর ভালো-মন্দের উপর ঈমান আনি। এর সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আমরা ঈমান আনি যে সবকিছু তাঁর ইচ্ছার অধীন, তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই হয় এবং তিনি যা ইচ্ছা করেন না তা হয় না, আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাদের সকল আমলের স্রষ্টা এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর বান্দারা তাদের আমল বাছাই করতে সক্ষম। এবং তাঁর বিচার এবং হুকুম তাঁর রহমত, অনুগ্রহ এবং ন্যায়পরায়ণতার বাহিরে যায় না।

● আমরা এই মর্মে ঈমান আনি যে কবরের আজাব এবং নিয়ামত উভয়েই সত্য।

আল্লাহ চাইলে শাস্তি যোগ্যদের শাস্তি প্রদান করেন এবং ইচ্ছা হলে ক্ষমা করে দেন। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিভিন্ন হাদিস এবং আল্লাহর এই আয়াত, {আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পার্থিব জীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ জালেমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা, তা করেন।} [ইব্রাহীম ২৭] এর ভিত্তিতে মুনকার আর নাকিরের বিষয়ে ঈমান আনি।

● আমরা মৃত্যুর পর এবং কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থানের ব্যাপারে ঈমান আনি এবং এই ব্যাপারেও ঈমান আনি যে আল্লাহর বান্দা এবং তার আমলকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে। আমরা বিচার দিবস, মিজান, হাউজে কাউসার, পুল-সিরাতের উপর ঈমান আনি এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য বলে মেলে নেই।

● আমরা কিয়ামতের আলামত সমূহের উপর ঈমান আনি – যা নবী ﷺ এর সহীহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আমরা ঈমান আনি আদম عليه السلام থেকে শুরু করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ফিতনা, অর্থাৎ দাজ্জালের ফিতনা উপর, ঈসা عليه السلام এর ফিরে আসা এবং ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার উপর এবং নবুওয়্যাতের আদলে খিলাফাহ ফিরে আসার উপর (আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে যা ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে)।

● আমরা এই বিষয়ে ঈমান আনি যে শাফায়াতকারীদের শাফায়াতের দরুন আল্লাহ একদল মুয়াহহিদিনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বের করে নিয়ে আসবেন, একমাত্র তারই শাফায়াত গ্রহণ করা হবে যাকে আল্লাহ শাফায়াত করার অনুমতি প্রদান করবেন এবং যার শাফায়াতের উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন।

● আমরা নবী ﷺ এর শাফায়াতের উপর এবং তাকে বিচার দিবসে মাকামে মাহমূদে স্থান দেয়ার ব্যাপারে ঈমান আনি।

● আমার বিশ্বাস করি যে ঈমান হলো নিয়ত, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আমলের সমন্বয়, তা হলো অন্তরে বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল করা। এই তিনটির যে কোন একটি বা দুটি পূর্ণ করা যথেষ্ট নয়... অন্তরের বিশ্বাস হল এর সাক্ষ্য এবং আমলের সমন্বয়। অন্তরের সাক্ষ্য হলো এর ইলম এবং স্বীকৃতি আর অন্তরের আমল হলো ভালোবাসা, ভয়, আশা ইত্যাদি। আমরা বিশ্বাস করি যে আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহ'র মাধ্যমে তা হ্রাস পায়। সত্যবাদী

নবী ﷺ অবগত করেছেন যে ঈমানের শাখা-প্রশাখা রয়েছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" হলো ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা এবং রাস্তা থেকে ক্ষতিকর কিছু সরানো হলো সর্বনিম্ন শাখা। ঈমানের শাখা সমূহের মধ্যে কিছু শাখা রয়েছে যা মৌলিক, অর্থাৎ যদি তা লোপ পায় তাহলে ঈমানও লোপ পায়, যেমন তাওহীদ, সালাত এবং এমন সকল অন্যান্য বিষয় যাকে শরীয়ত ঈমানের মৌলিক বিষয় হিসেবে নির্ধারিত করেছে এবং যা পরিত্যাগ করলে ঈমান হারিয়ে যায়। একইভাবে ঈমানের এমন অনেক শাখা যা পালন করা ওয়াজিব – যেমন ব্যভিচার, মদ, চুরি ইত্যাদি ত্যাগ করা – ঈমানের এই শাখাগুলো পরিত্যাগ করলে ঈমান হ্রাস পায়।

● ব্যভিচার, মদ্যপান, চুরি ইত্যাদি গুনাহর কারণে আমরা মুসলিমদের ক্বিবলাহ'র দিকে সালাত আদায়কারী কোন মুয়াহহিদকে তাকফির করি না, যতক্ষণ না সেই এই বিষয়গুলোকে হালাল মনে করে। ঈমানের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান চরমপন্থি খাওয়ারিজ এবং শিথিলতাপন্থী মুরজিয়াদের অবস্থানের মধ্যবর্তী।

● আমরা বিশ্বাস করি যে কুফর হলো দুই প্রকার: ছোট এবং বড়। যারা কুফরি করে তাদের উপর কুফরের বিধান পতিত হয়, হোক তা অন্তরের বিশ্বাস বা বক্তব্য অথবা আমলের ক্ষেত্রে। তবে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফির (কাউকে কাফির হিসেবে সাব্যস্ত করা) করা এবং তার অনন্তকাল জাহান্নামে থাকার বিষয়টি তাকফিরের শর্ত পূরণ এবং এর নিরোধক বিষয় সমূহের অনুপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। আমরা যখন এমন কোন দলীল বর্ণনা করি যা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করে বা শাস্তির হুমকি প্রদান করে, তাকফির বা তাফসিক (কাউকে ফাসিক হিসেবে সাব্যস্ত করা) নির্ধারণ করে, তখন তা আমরা আম ভাবে বর্ণনা করি, আমরা এই আম ভাবে বর্ণিত দলীল সমূহকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করি না যতক্ষণ না তার কাছ থেকে এই বিধান প্রয়োগের আবশ্যক বিষয়গুলো প্রকাশ পায়, যার ব্যাপারে কোন বিরোধিতা নেই। আমরা সন্দেহের ভিত্তিতে বা মানুষের কোন আমলের অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ফল বা কারও কোন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কুফরির সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার ভিত্তিতে কাউকে তাকফির করি না।

● আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল যাকে তাকফির করেছেন আমরাও তাকে তাকফির করি। একইভাবে যারাই ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করে তাকেও আমরা তাকফির করি, কারণ হুজ্জাহ প্রতিষ্ঠিত হোক আর না হোক এমন ব্যক্তি কাফির। কিন্তু আখিরাতে একমাত্র তারাই শাস্তি পাবে যাদের কাছে হুজ্জাহ পৌঁছেছে। আল্লাহ ﷻ

বলেন, {একজন রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমরা কাউকে শাস্তি প্রদান করি না।} [আল-ইসরা: ১৫]

● এমন ব্যক্তি যে শাহাদাতাইন (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ – মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) উচ্চারণ করে, বাহ্যিক ভাবে নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে এবং ইসলাম ভঙ্গকারী কোন কিছুর সম্পাদন করে না, তাকে আমরা মুসলিম হিসেবেই গণ্য করি এবং তার গোপন বিষয় আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেই। যে ব্যক্তি বাহ্যিক ভাবে ইসলামের রীতিনীতির অনুসরণ করে তার বিধান হলো সে একজন মুসলিম, কারণ মানুষের বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতেই তার বিচার করা হয় আর আল্লাহই তার গোপন বিষয়ের ব্যাপারে দায়িত্বশীল।

● আমাদের কাছে রাফিদা শিয়ারা হলো এমন ফিরকা, যারা শিরক, রিদ্দাহ এবং হিরাবাহ (মুসলিমদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ)-তে লিপ্ত।

● আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি কোন ভূমিতে কুফরের বিধান ক্ষমতাসীন হয় এবং ইসলামের বিধানের উপর কুফরের বিধান বলবত হয়ে যায়, তাহলে সে ভূমি হলো দারুল কুফর, কিন্তু এর ভিত্তিতে সেই ভূমিতে বসবাসরত সবাইকে তাকফির করিনা। আমরা গুলাতদের (দ্বীনের ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বনকারী) মত বলি না, “মানুষের আসল অবস্থা হলো যে তারা সম্পূর্ণ কাফির”, বরং প্রত্যেক মানুষ তার নিজেরে অবস্থা অনুসারে মূল্যায়ন করা হবে এবং মানুষের মধ্যে মুসলিম এবং কাফির দুই ধরণের লোকই আছে।

আমরা বিশ্বাস করি যে গণতন্ত্র ও সকল প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতা – যেমন জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ, কমিউনিজম এবং বাথিজম – পরিষ্কার কুফর যা একজনের ইসলামকে বাতিল করে মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।

● ফজিলতপূর্ণ প্রথম তিন প্রজন্মের সালাফে সালেহিনগণের বুঝ অনুসারে কোরআন এবং সুন্নাহই হলো আমাদের দলীল সমূহের উৎস।

● মুসলিমদের মধ্য থেকে সৎ, গোনাহগার বা অবস্থা সম্পর্কে অনবগত যে কোন ব্যক্তির পিছনে নামাজ পড়াকে আমরা জায়েজ মনে করি।

● ইমাম থাকুন আর না থাকুন, তিনি ন্যায়পরায়ণ হোন আর অত্যাচারী হোন, জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। ইমাম না থাকার দরুন জিহাদ করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করা হবে না, কারণ তা করা হলে জিহাদের ফজিলত অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যদি গণিমত পাওয়া যায়, তাহলে তা অর্জনকারীদের মধ্যে শরীয়ত অনুসারে ভাগ করে দেয়া হয়। প্রত্যেক মুমিনকে অবশ্যই আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, এমনকি যদি তিনি একাও হন।

● মুসলিমদের রক্ত, সম্মান এবং সম্পদ আমাদের কাছে হারাম, তা থেকে একমাত্র তাই আমাদের জন্য হালাল হবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পতিত বলে ঘোষণা করেছেন।

● যদি কুফফারদের মধ্য থেকে কোন আগ্রাসী শত্রু মুসলিমদের হুরমতের উপর সীমালঙ্ঘন করে, তখন জিহাদ নিঃশর্ত ফরজে আইন (বা ব্যক্তিগত ফরজ) হয়ে যায় এবং কুফফারদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত যুদ্ধ করা হয়। তা এই কারণে যে, ঈমানের পর মুসলিমদের দ্বীনি এবং দুনিয়াবি বিষয়ে ফাসাদ সৃষ্টিকারী আগ্রাসী দুশমনকে প্রতিহত করার চেয়ে আর বড় কোন ফরজ নেই।

● ইজমা অনুসারে, রিদ্দাহ'র কুফর কোন কাফির আসলির (এমন কাফির যে কখনও ইসলামে প্রবেশ করে নি) কুফরের চেয়ে গুরুতর। সেই কারণে কাফির আসলিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের চেয়ে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

● একজন কাফির কখনও ইমাম (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী) হতে পারবে না, আর যদি কোন ইমাম কুফরে পতিত হয় তাহলে তার ক্ষমতা বাতিল হয়ে যায় এবং তার আনুগত্য করা আর আবশ্যক থাকে না। তদুপরি তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা, তাকে ক্ষমতা থেকে সরানো এবং একজন ন্যায় পরায়ণ ইমাম নিযুক্ত করা মুসলিমদের উপর সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব হয়ে যায়।

● আমাদের দ্বীন হিদায়াত আনয়নকারী কোরআন আর নুসরত প্রদানকারী তরবারি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাই আমাদের জিহাদ হলো তরবারি-বর্শা আর দলীল-হুজ্জাহ দ্বারা।

● যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুর দিকে আহ্বান করে, আমাদের দ্বীনকে

অপমান করে অথবা আমাদের বিরুদ্ধে তাদের তরবারি উঁচু করে, তাকে আমরা মুহারিব (যুদ্ধরত শত্রু) বলে সাব্যস্ত করি।

● আমরা মতপার্থক্য এবং বিভক্তিকে পরিত্যাগ করি, ঐক্যের দিকে আহ্বান করি এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করি , কারণ তা মুসলিমদের উপর ফরজে কিফায়া। যদি তাদের একটি দল এই ফরজ আদায় করে তাহলে বাকিদের জন্যও তা আদায় হয়ে যায়। আমরা বিশ্বাস করি আহলুল হাল্লি ওয়াল আক্বদ এর বায়াত প্রাপ্ত মুসলিমদের ইমামের কথা শুনা এবং মান্য করা ওয়াজিব, তার আনুগত্যকে ত্যাগ করা জায়েজ নয়, আর এ ব্যাপারে কোন ইখতিলাফ নেই। যদি কেউ ইমামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাহলে তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হবে এবং যদি তারা তার আনুগত্যে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করা হবে যতক্ষণ না তারা ফিরে আসে। সুতরাং, "যারাই এমন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে যে তার কাঁধে আনুগত্যের বায়াত নেই, তার মৃত্যু জাহেলিয়্যাতের মৃত্যু।"

● ইজতিহাদী মাসায়েলের জন্য আমরা কোন মুসলিমকে ত্যাগ করি না বা তাকে গুনাহগার সাব্যস্ত করি না।

● আমাদের দৃষ্টিতে সকল উম্মাহ – এবং বিশেষ করে মুজাহিদগণের – জন্য একটি ঝাণ্ডার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ওয়াজিব।

● মুসলিমরা হলো একটি উম্মাহ। তাকওয়া ভিত্তি ছাড়া তাদের মধ্যে অনারবদের উপর আরবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সকল মুসলিমের রক্তের মূল্য সমান, তারা তাদের মধ্যে ন্যূনতম ব্যক্তির জন্যও দায়িত্বশীল আর আল্লাহ ﷻ আমাদের যে সকল নাম দ্বারা আখ্যায়িত করেছেন আমরা সেগুলো থেকে মুখ ফিরাইনা।

● আমরা আল্লাহর আউলিয়াদের আমাদের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করি এবং তাদের সমর্থন করি, আমরা আল্লাহর দুশমনদের দুশমন হিসেবে গ্রহণ করি এবং আমরা মিল্লাতুল ইসলাম ছাড়া বাকি সব মিল্লাতকে অস্বীকার এবং অবিশ্বাস করি, এভাবেই আমরা কিতাব এবং সুন্নাহর পথে এগিয়ে চলি এবং বিদাআত ও গোমরাহির পথকে পরিহার করি।

[এখানেই প্যামফ্লেটটির সমাপ্তি]

মৃত্যুর পর পুনরুত্থান

আলোচ্য কিতাবে তারা উল্লেখ করেছে: *"সন্ত্রাসবাদীদের প্রথম বিভ্রান্তি হলো, ইসলামে ঈমানের সর্বাবাদি সম্মত বিষয় হলো, ঈমান আনতে হবে সাতটি বিষয়ে। সেগুলোর মধ্যে একটি হলো البعث بعد الموت 'মৃত্যুর পর পুনরুত্থান'। কিন্তু এরা ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির কোনো উল্লেখ করেনি। অথচ এই আকীদা ব্যতীত কেউ মুমিন বলে গণ্য হতে পারে না। এতেই স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম ও ঈমানের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই এবং ইসলাম ও ঈমান সম্পর্কে তাদের সঠিক জ্ঞান নেই।"* [পৃষ্ঠা ৩১]

এইখানে তারা দাবী করেছে যে মুজাহিদগণ البعث بعد الموت বা 'মৃত্যুর পর পুনরুত্থান'-এ বিশ্বাস করে না। এটি একটি হাস্যকর এবং নির্লজ্জ মিথ্যাচার, এমন মিথ্যাচার যা করতে ইহুদী-নাসারাও লজ্জাবোধ করবে। তারা তাদের এই বক্তব্যে মাধ্যমে দাবি করেছে যে মুজাহিদরা মুমিন না আর তাদের ঈমানের সঠিক জ্ঞানও নেই। তাদের এই "মুমিন বলে গণ্য হতে পারে না" বক্তব্য মুজাহিদদের তাকফির করারই ভিন্নরূপ।

"এই আমাদের আক্বিদাহ, এই আমাদের মানহায" নামক প্যামফ্লেটটি দিয়ে আমরা বলেছিলাম যে সেখানে তাদের উত্থাপিত বেশ কয়েকটি মিথ্যার উত্তর আছে। প্যামফ্লেটতিতে উল্লেখিত দাওলাতুল ইসলামের বক্তব্য হলো: "আমরা মৃত্যুর পর এবং কিয়ামত দিবসে পুনরুত্থানের ব্যাপারে ঈমান আনি এবং এই ব্যাপারেও ঈমান আনি যে আল্লাহর বান্দা এবং তার আমলকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে। আমরা বিচার দিবস, মিজান, হাউজে কাউসার, পুল-সিরাতের উপর ঈমান আনি এবং জান্নাত ও জাহান্নামকে সত্য বলে মেলে নেই।" এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে তাদের উত্থাপিত অভিযোগ সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন।

তারপর তারা লিখেছে *"তাদের দ্বিতীয় বিভ্রান্তিমূলক বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, তারা কোন কোন গ্রন্থে ঈমানের শাখা বলেছে ৭০টি আর আকীদা বলেছে ৭৩টি।"* [পৃষ্ঠা ৩২] তারা এখানে যে দাবী করেছে তার ব্যাপারে কোন দলীল পেশ করেনি। দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে এটিও তাদের একটি উদ্ভট মিথ্যা। উপরে প্রদত্ত প্যামফ্লেটে দাওলাতুল ইসলামের বক্তব্য হলো: "সত্যবাদী নবী ﷺ অবগত করেছেন যে ঈমানের শাখা-প্রশাখা রয়েছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হলো ঈমানের সর্বোচ্চ শাখা এবং

রাস্তা থেকে ক্ষতিকর কিছু সরানো হলো সর্বনিম্ন শাখা।” এখানে ঈমানের শাখা প্রশাখার সংখ্যা উল্লেখ করা হয় নি, অর্থাৎ এটিও তাদের আরেকটি মিথ্যাচার।

ওয়াসীলা

একই পৃষ্ঠায় তারা দাবি করেছে, *“সন্ত্রাসীগণ বলেন, ‘মুমিন কাফের হয়ে যায় মাধ্যম বা ওয়াসীলা গ্রহণ করার মাধ্যমে।’”* [পৃষ্ঠা ৩২] কিন্তু সন্ত্রাসীগণ কোথায় বলেন সেটার কোন উল্লেখ নেই।

যাই হোক, প্রথম কথা হলো, দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ ‘যেকোন ধরণের ওয়াসীলা গ্রহণ কেউ কাফির হয়ে যায়’ এই মর্মে কখনও কোন বক্তব্য দেন নি । বরং, ওয়াসীলার নামে কবর-মাজার পূজা আর পীর-পূজাকেই তারা শিরক এবং কুফরি বলে আখ্যায়িত করেন। এই বিষয়ের ব্যাপারে বিস্তারিত লিখতে গেলে আমরা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যাব, তাই আমরা বিস্তারিত আলোচনায় যাবো না।

এই বিষয় বস্তুর আলোচনায় তারা কোরআনুল কারীমের একটি আয়াতের উল্লেখ করেছে। {হে ঈমানদারগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর নৈকট্য লাভের জন্য ওয়াসীলা অন্বেষণ করো আর তাঁর রাহে জিহাদ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।} [আল-মায়িদাহ: ৩৫] কোরআনুল কারীমের বরকতময় এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাদের তাঁর নৈকট্য লাভের ওয়াসীলা অন্বেষণের আদেশ প্রদান করেছেন, এই আয়াতে উল্লেখিত الوسيلة শব্দের তাফসীরে সকল মুফাসসিরগণই একমত যে এর অর্থ القربة বা নৈকট্য লাভ। কাতাদাহ رحمه الله বলেন: “এর ভাবার্থ হচ্ছে- আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অনুসারে আমল করে তাঁর নৈকট্য লাভ করা।” অর্থাৎ, মুমিনের উচিৎ সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সচেষ্ট হওয়া এবং এটাই ওয়াসীলার সঠিক অর্থ, কারণ এর ব্যাপারে মুফাসসিরগণের ইজমা রয়েছে।

একই আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ ﷻ বলেন, {আর তাঁর রাহে জিহাদ করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।} [আল-মায়িদাহ: ৩৫] বর্তমান যুগের মুনাফিক আর কাপুরুষরা জিহাদের নাম শুনলেই এর অর্থকে বিকৃত করতে শুরু করে, যেমনটা আলোচ্য কিতাবে তারা করেছে, তারা সেখানে এই আয়াতের অর্থ করতে গিয়ে وجاهدو শব্দের অনুবাদ করেছে “সাধনা-সংগ্রাম”। বাংলা ভাষায় ন্যূনতম জ্ঞান রাখা যে কোন

ব্যক্তি সহজেই “যুদ্ধ” আর “সাধনা-সংগ্রাম” শব্দদুটির মধ্যে বিশাল পার্থক্য খুঁজে পাবেন। এটাও তাদের হককে গোপন করার একটি মরিয়া প্রয়াস। এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম আবু জাফর আত-তাবারী ﵀ বলেন: “আল্লাহ তায়ালা তাঁর ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারীদেরকে বলেছেন, হে মুমিনগণ! তোমরা আমার পথে আমার ও তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। আল্লাহ তায়ালার পথ মানে তাঁর দ্বীন ও শরীয়ত, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন, অর্থাৎ ইসলাম। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর এবং তাদেরকে একনিষ্ঠ ইসলামে দাখিল করা জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করো।” এখানে ইমাম ﵀ قتل (কিতাল) বা যুদ্ধ শব্দের ব্যবহার করেছেন এবং কিতালকে কাফিরদের ইসলামের প্রবেশ করানোর পন্থা বলে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আল্লাহ ﷻ যখন একই আয়াতে দুটি বিষয় উল্লেখ করেন তা তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়। এই আয়াতে লক্ষণীয় বিষয় হলো আল্লাহ ﷻ ওয়াসীলা শব্দের পর পরই আদেশ করেছেন وجاهدو অর্থাৎ “এবং জিহাদ করো”। যা নির্দেশ করে যে, জিহাদ করা হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম ওয়াসীলা বা মাধ্যম। আর এর ব্যাপারে আমরা দলীল হিসেবে পেশ করতে পারি যে আল্লাহ ﷻ বলেন, {আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর।} [আস-সাফ: ৪] এ বিষয়ে আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। আল্লাহ কাফিরদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদকে তাঁর নৈকট্য লাভের ওয়াসীলা বানিয়ে দিন।

তাদের জাহমী আক্বিদাহ

ওয়াসীলা সম্পর্কে তাদের মিথ্যাচারের পরপরই তারা পরবর্তী পৃষ্ঠায় লিখেছে: *“তবে হ্যাঁ; সব কিছু আল্লাহ তা’আলা প্রদান করেন। কেউ যদি মনে করে, মাযারে শায়িত বুজুর্গ ব্যক্তিটি বাঞ্ছিত বিষয়াদি প্রদানের ক্ষমতা রাখেন, তবে তা কুফুরী হবে এবং ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। কিন্তু তারপরও কাউকে কাফির ফাতওয়া দেয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ, ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, ১০০টি ঈমান নষ্টের আলামতের মধ্যে ৯৯টি আলামত কারো মাঝে পাওয়া গেলেও তাকে কাফের বা তাওহীদের বিশ্বাসী নয় এমন ফাতওয়া দেয়া যাবে না। বরং তার জন্য দোআ ও বোঝানের চেষ্টা করতে হবে। (ছানাউল্লাহ পানিপথি, মালাবুদ্দা মিনহু)”* [পৃষ্ঠা ৩৩] এখানে তারা তাদের চরম জাহমী আক্বিদাকে সমর্থন করার জন্য ইমাম আবু

হানীফা ﷺ এর একটি বক্তব্যকে বিকৃত করেছে। ইমাম আবু হানীফা ﷺ এর প্রকৃত বক্তব্য নিম্নরূপ:

إذا وُجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم، ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه فينبغي للمفتي والقاضي أن يعمل بذلك الوجه

অর্থাৎ : "যদি নিরান্নব্বইটি সম্ভাবনা একজন মুসলিমের তাকফিরের দিকে ইশারা করে এবং একটি ইশারা করে তার ইসলামের ওপর টিকে থাকার দিকে, তাহলে মুফতি এবং কাজির উচিৎ সেই একটিকে আমলে নেয়া।"

এই বক্তব্যে প্রকৃত অর্থ হলো পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে বা সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে তাকফির করা উচিৎ নয়, কারণ সন্দেহ তাকফিরের ক্ষেত্রে নিরোধক একটি বিষয়। এখন দেখা যাক উপরোক্ত প্যামফ্লেট অনুসারে এই ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের বক্তব্য কি। সেখানে উল্লেখ আছে: "কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফির (কাউকে কাফির হিসেবে সাব্যস্ত করা) করা এবং তার অনন্তকাল জাহান্নামে থাকার বিষয়টি তাকফিরের শর্ত পূরণ এবং এর নিরোধক বিষয় সমূহের অনুপস্থিতির উপর নির্ভরশীল। আমরা যখন এমন কোন দলীল বর্ণনা করি যা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করে বা শাস্তির হুমকি প্রদান করে, তাকফির বা তাফসিক (কাউকে ফাসিক হিসেবে সাব্যস্ত করা) নির্ধারণ করে, তখন তা আমরা আম ভাবে বর্ণনা করি, আমরা এই আম ভাবে বর্ণিত দলীল সমূহকে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করি না যতক্ষণ না তার কাছ থেকে এই বিধান প্রয়োগের আবশ্যক বিষয়গুলো প্রকাশ পায়, যার ব্যাপারে কোন বিরোধিতা নেই। আমরা সন্দেহের ভিত্তিতে বা মানুষের কোন আমলের অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ফল বা কারও কোন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কুফরির সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার ভিত্তিতে কাউকে তাকফির করি না।" অর্থাৎ দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ কাউকে তাকফির করার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহর দেখানো পথ অনুসরণ করেন এবং সন্দেহের ভিত্তিতে কাউকে তাকফির করা থেকে বিরত থাকেন।

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ওয়াসীলার এই আলোচনায় তাগূতের গুপ্তচর কপট আলেমরা এক ঢিলে অনেক পাখি মারা প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তারা ওয়াসীলার নামে তাদের কুফরি মতবাদকে ন্যায়-সংগত করার চেষ্টা করে করেছে, তারা চেষ্টা করেছে ইমাম আবু হানীফা ﷺ এর বক্তব্যকে বিবৃত করে তাদের গোমরাহ আক্বিদাকে সত্যায়িত করার, আর সর্বোপরি মুজাহিদগণের চরমপন্থি এবং অন্যায়ভাবে তাকফিরকারী প্রমাণ করার।

কিন্তু মিথ্যুকরা আল্লাহর কিতাব থেকে কখনই সঠিক দলীল নিয়ে আসতে পারবে না, আলহামদুলিল্লাহ। তাছাড়া তারা ইমাম আবু হানীফা ﵀ এর বক্তব্য যে কিতাব থেকে চয়ন করেছে, সেই কিতাবে রাসূল ﷺ সহ যেকোন নবীকে কে গালিগালাজ তো দূরের কথা তাকে নিয়ে ঠাট্টা-মশকরাকারীদের কাফির বলে ফাতওয়া প্রদান করা হয়েছে। আশ্চর্যে বিষয় হলো আলোচ্য এই কিতাবের সম্পাদনাকারীদের মধ্যে এমন মুরতাদ আলেমও রয়েছে যে আল্লাহর নবী ﷺ কে অকথ্যভাষায় গালি-গালাজ কারী মুরতাদকে মুসলিম দাবি করে তার জানাজায় ইমামতি করে নবী ﷺ এর অবমাননায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে। এই বাস্তবতাগুলো উপেক্ষা করে যারা তার কাছ থেকে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ করার আশা রাখে তাদের মত জাহিল আর কে হতে পারে? আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় যে, বাংলা সাধারণ মুসলিমদের আরবি ভাষাজ্ঞানের অভাবকে তারা পুঁজি করে তাদের গোমরাহ করার চেষ্টা করছে। আমরা ইতিমধ্যে একাধিকবার তাদের ভাষার মাধ্যমে বিভ্রান্তির চেষ্টার উদাহরণ তুলে ধরেছি এবং এই কিতাবের আসন্ন আলোচনায়ও এরকম বিষয় আসবে যেখানে তারা কোরআন এবং উলামাদের বক্তব্যের বিকৃত অনুবাদ করেছে। তাই, নিজেদেরকে আল্লাহর তাওফিকে গোমরাহির ফাঁদ থেকে রক্ষা করার জন্য সকল মুসলিমেরই নূন্যতম আরবি ভাষার জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ। আল্লাহ আমাদের জ্ঞান দান করুন।

তাকলিদ

তারপর তাদের দাবি: *“জঙ্গিদের দাবি হলো, তারা ‘আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর অনুসারী। তাঁর মতাদর্শ হলো তাকলীদ করা কোন ইমামের অনুসরণ করা কুফুরী। এ কারণে তারা তাকলীদকে ইসলাম ও মুসলিমদের জন্য ঈমান ধ্বংসাত্মক কর্মরূপে গণ্য করে।”* [পৃষ্ঠা ৩৩] তাছাড়া চার বিখ্যাত মাযহাবের বর্ণনা নিয়ে এসে সূরা নাহল এর ৪৩ আয়াত উল্লেখ করে লিখেছে: *“এরা তাকলীদ অস্বীকার করে মূলত আল-কুরআন ও আল-হাদীসকেই অস্বীকার করছে।”* মোট কথা তারা প্রমাণ করতে চেয়েছে যে জঙ্গিরা মাযহাব মানা বা ইমাম মানাকে কুফরি বলে মনে করে এবং একে ঈমান ধ্বংসকারী কর্মরূপে গণ্য করে। এখানে একটা মজার বিষয় হলো তারা বলেছে জঙ্গিরা *“আব্দুল ওয়াহহাব নজদীর অনুসারী”* কিন্তু উক্ত ইমামের প্রকৃত নাম হলো মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব আল নাজদী ﵀। অর্থাৎ তিনি আবদুল ওয়াহহাব নন, তিনি আবদুল ওয়াহহাব পুত্র মুহাম্মাদ। অর্থাৎ এই কিতাবের গর্দভ লেখকরা কি বলছে আর কাকে

বলছে, তারা নিজেরাই জানে না। যাই হোক, এখন দেখা যাক দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের এই দাবী কতটুকু সত্য। দাওলাতুল ইসলামের সাবেক মুখপাত্র শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল-আদনানী ﷺ তার অফিসিয়াল বক্তব্যে বলেন: "আমরা সত্যবাদিতার সাথে আল্লাহর শরীয়তকে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকারী খোরাসানের সকল মুজাহিদদের আহ্বান জানাচ্ছি, আমরা তাদের আহ্বান জানাচ্ছি খিলাফাহ'র কাফেলাতে যোগদান করার জন্য এবং দলাদলি আর বিভক্তির মতানৈক্যকে নির্মূল করার জন্য। কারণ খিলাফাহ সকল মুসলিমকে সমবেত করে। সমবেত করে শামী, ইরাকি, ইয়েমেনি এবং মিশরীয়কে, সমবেত করে ইউরোপিয়ান, আমেরিকান, আফ্রিকান সবাইকে, আরব-আজম নির্বিশেষে। সমবেত করে হানাফি, শাফীঈ, মালিকী আর হাম্বলীকে, তাই আপনাদের খিলাফাহ'র দিকে এগিয়ে আসুন।" [অডিও বক্তব্য: يا قومنا أجيبوا داعي الله; হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও] তাছাড়া দাওলাতুল ইসলামের অফিসিয়াল প্রকাশনা সংস্থা "মাকতাবাহ আল-হিম্মাহ" এর বিপুল সংখ্যক প্রকাশনায় বিভিন্ন মাযহাবের উলামাদের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, তাদের এই অভিযোগ দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণই মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। তাক্বলীদের ক্ষেত্রের বিস্তারিত আলোচনা আছে, তাক্বলীদের বিভিন্ন প্রকারভেদও আছে। সকল তাক্বলীদ শিরক নয়, তবে কোরআন-সুন্নাহকে তোয়াক্কা না করে কোন ব্যক্তি বা কোন কিছুর অন্ধ অনুসরণ করা কোরআন সুন্নাহর দলীল অনুসারে শিরক এবং এ ব্যাপারে দ্বীনের সামান্যতম জ্ঞান রাখা ব্যক্তিরও দ্বিমত থাকার কথা নয়, তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো তারা এখানে প্রমাণ করতে চেয়েছে যে মুজাহিদিনরা কোন ইমাম মানে না, আর ইমাম মানাকে কুফরি মনে করে, উপরে প্রদত্ত প্রমাণ অনুসারে কথাটি ভিত্তিহীন।

দ্বীন কায়েম বিষয়ে তাদের মিথ্যাচার

আমরা আমাদের কিতাবে এখন পর্যন্ত মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাগূতের এজেন্টদের মিথ্যাচার ব্যবচ্ছেদ করেছি, পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের সকল অভিযোগই উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং মিথ্যা। কিন্তু এই কিতাবে তারা মুজাহিদদের বিরুদ্ধেই শুধু মিথ্যাচার করে নি, বরং তারা তাদের এই কিতাবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যাচার করেছে। আল্লাহ ﷻ এমন লোকদের ব্যাপারে কোরআনুল কারীমের বলেন: {তারা আল্লাহর আয়াত সমূহ নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করে, অতঃপর লোকদের নিবৃত রাখে তাঁর পথ থেকে, তারা যা করে চলছে, তা অতি নিকৃষ্ট।} [আত-তাওবাহ: ৯]

আল্লাহ ﷻ আরও বলেন: {নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুত: তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।} [আল-বাক্বারাহ: ১৭৪] তারা আল্লাহর নাজিলকৃত আয়াত সমূহকে মানুষের সামনে বিকৃত করে উপস্থাপন করে, আল্লাহর রাসূল ﷺ আর তার সাহাবাগণের সুন্নাতকে অস্বীকার করে।

তারা কিতাবটিতে 'ইকামতে দীন' সম্পর্কে উগ্রবাদীদের অপব্যাখ্যা এর সঠিক ব্যাখ্যা হিসেবে তারা বলেছে: *"তাদের ও তাদের রাজনৈতিক গুরুদের অনেকের কিতাব পুস্তকে তাদের নিজ, নিজ মনগড়া ব্যাখ্যা রয়েছে। যার ফলে তাদের অনুসারী ও পাঠকরা দীন কায়েম বলতে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থায় ইসলাম কায়েম মনে করে। তাওহীদ, আল্লাহর আনুগত্য তথা নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জকে মনে করে প্রশিক্ষণ আর রাষ্ট্র কায়েম হলো, চূড়ান্ত বা মুখ্য। অথচ বিশ্ববরেণ্য ইমাম, উলামা, মাশায়েখগণের ব্যাখ্যা হলো, সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার প্রভৃতি হলো দীন মেনে চলার জন্য সহায়ক। এগুলো দীনের জন্য এমন শর্ত নয় যে, এগুলো ব্যতিরেকে দীন চলে না। আর এখানে দীন কায়েম অর্থ আল্লাহর তাওহীদ, রাসূলুল্লাহর রিসালাত, উভয়ের ইতা'আত, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও হালাল-হারাম প্রভৃতি। রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ছাড়াও যদি কেউ এসব বিধান পালনে সক্ষম হয় সেও নাজাত লাভ করবে। সর্বস্তরে দীন কায়েমের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা থাকলেই চলবে, কায়েম করে যাওয়া অপরিহার্য নয়। কিন্তু তাওহীদ, নামায, রোযা, যাকাত বাস্তবায়ন করে যেতে হবে।*

বিগত ১৪০০ বছরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমল, খুলাফায়ে রাশেদীনের (রা.) ও হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর আমলের পর মুসলিম বিশ্বের কোথাও প্রকৃত ইসলামী শাসন ছিল না। তা সত্ত্বেও অসংখ্য অগণিত মানুষ তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধি-বিধান পালন করে জীবন অতিবাহিত করেছেন, তারা আল্লাহর নিকট নাজাত লাভে যোগ্য বিবেচিত হবেন।" [পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮]

তারা বলেছে (জিহাদিরা) *তাওহীদ, আল্লাহর আনুগত্য তথা নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জকে মনে করে প্রশিক্ষণ আর রাষ্ট্র কায়েম হলো, চূড়ান্ত বা মুখ্য।* এই বক্তব্যটিও তাদের মিথ্যাচারের একটি নির্লজ্জ উদাহরণ, এমন বক্তব্য ব্যাপারে তারা কোন দলীল প্রদর্শন করেনি। সালাত, সিয়াম, যাকাত এবং হজ্জ এগুলো দ্বীনের ভিত্তি এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, এগুলোকে প্রশিক্ষণ আর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে মুখ্য হিসেবে বিভক্ত করা দাওলাতুল

ইসলামের মুজাহিদগণের মানহায নয়। এই ব্যাপারে তারা কখনই কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে না।

তাছাড়া তারা কৌশলে ইসলামের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। তারা দাবি করেছে *বিগত ১৪০০ বছরে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমল, খুলাফায়ে রাশেদীনের (রা.) ও হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (র.)-এর আমলের পর মুসলিম বিশ্বের কোথাও প্রকৃত ইসলামী শাসন ছিল না।* এই বক্তব্যটি একটি প্রকাণ্ড মিথ্যাচার, ইসলামের প্রাথমিক যোগে উপরে উল্লেখিত খুলাফাগণ ছাড়াও অন্যান্য খুলাফাহগণ পূর্ণ ইসলামী শরীয়ত কায়েম রেখেছেন। তাদের জামানায় জুলুম অত্যাচারের প্রমাণ থাকলেও তারা আল্লাহর শরীয়ত পরিবর্তন করার দৃষ্টতা প্রদর্শন করেন নি। ইসলামের ইতিহাসবিদগণের মত অনুসারে আল্লাহর শরীয়ত পরিবর্তন করার দৃষ্টতাপূর্ণ কুফরি প্রথম শুরু হয় তাতারদের জামানায়, তারাই প্রথম ইয়াসিক্ব নামক মানব রচিত সংবিধান নিয়ে আসে। কিতাবের পরবর্তী অংশে এর ব্যাখ্যা আসছে, ইনশাআল্লাহ। তাই খুলাফাহদের সাথে বর্তমান শাসন ব্যবস্থার মুরতাদ শাসকদের তুলনা করার সূর্যের সাথে মোমবাতির তুলনা করার সমান। আল্লাহ মুরতাদদের ধ্বংস করুন।

"দ্বীন কায়েম" একটি ব্যাপক আলোচনা সাপেক্ষ বিস্তারিত বিষয়। আমাদের এই কিতাবের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করে আমরা দ্বীন কায়েম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। দ্বীন কায়েম নিয়ে তাদের এই শিশুসুলভ বক্তব্যের খণ্ডন করার জন্য আমাদের দ্বীন (الدين) এবং ইকামাহ (إقامة) এই শব্দ দুটির অর্থ সম্পর্কে আলোচনা করবো। প্রথমে দ্বীন (الدين); দ্বীনের শাব্দিক অর্থ হল, নমনীয় হওয়া, অনুগত হওয়া। যেমন, আরবিতে বলা হয়, دنته فدان অর্থাৎ "আমি তাকে অনুগত করেছি ফলে সে অনুগত হয়েছে।" শরীয়তের পরিভাষায় দ্বীন হল, ওই সকল বিষয়ের নাম, যার দ্বারা আল্লাহ সৃষ্টিকে তাঁর অনুগত করেছেন এবং তিনি তাদেরকে তার উপর অবিচল থাকার আদেশ করেছেন। প্রখ্যাত মুফাসসির সা'দী ﵀ বলেন: "(দ্বীন) হলো গোপনে ও প্রকাশ্যে এক আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করা, যে পদ্ধতি আল্লাহ রাসূলগণের জবানে নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" অর্থাৎ এর মধ্যে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সবগুলো বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু বাংলা ভাষায় দ্বীন শব্দের অর্থ করা হয় ধর্ম। বস্তুত দ্বীন আর ধর্মের মধ্যে দিন-রাতের পার্থক্য রয়েছে। বাংলা ভাষায় ধর্ম শব্দ পুরোপুরি ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক বা অন্তর্জাগতিক বিষয়াদিকে ইংগিত করে। দ্বীন আর ধর্ম এর মধ্যে সম্পর্ক বলতে গেলে

বলতে হবে, ধর্ম দ্বীনের অংশ বিশেষ মাত্র।

অপরদিকে, ইকামাহ (إقامة) শব্দের বেশ কিছু অর্থ রয়েছে, যেমন- প্রতিষ্ঠা করা, বাস্তবায়ন করা, কায়েম করা। যেমন যদি আরবিতে বলা হয় أقمنا الحد على سارق তার অর্থ হবে "আমরা চোরের উপর হদ (বা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) বাস্তবায়িত বা কায়েম করেছি।"

অর্থাৎ ইকামতে দ্বীন এর অর্থ হলো "আল্লাহু ﷻ তাঁর রাসূলের মাধ্যমে যা যা প্রেরণ করেছেন তার প্রত্যেকটি বিষয়কে যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করো।" শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ﷬ ইসলামী রাষ্ট্রের উপস্থিতির গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন, "লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানুষের বিষয়াদিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দ্বীনের ওয়াজিবাত বা আবশ্যিক বিষয় সমূহের মধ্যে অন্যতম। সত্য বলতে কি, এছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠিত বা কায়েম হবে না। একটি সংগঠিত সমাজ ছাড়া বনী আদমের কল্যাণ বা সুখ-সমৃদ্ধি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, কারণ তারা একে অপরের মুখাপেক্ষী; এবং এমন একটি সমাজের জন্য একজন শাসক অপরিহার্য।" [আস-সিয়াসতুশ শারঈয়্যাহ]

ইসলামী রাষ্ট্র আর একজন মুসলিম রাষ্ট্র নায়ক ছাড়া মুসলিমদের বড় জামায়াত বা জামাআহ আল-কুবরা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। যার সরাসরি অর্থ হলো মুসলিমরা জামায়াত এবং বাইয়াত, শুনা এবং মান্য করার নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। রাষ্ট্র ছাড়া সালাত, যাকাতকে সামাজিক পর্যায়ে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ সম্ভব নয়, যার ফলে নতুন প্রজন্মকে তাওহীদ-দ্বীন-ঈমান ইত্যাদির পূর্ণ জ্ঞান প্রদান করাও সম্ভব নয়। ইসলামী রাষ্ট্র না থাকলে মানুষের মধ্যে আদল প্রতিষ্ঠা, সৎ কাজে আদেশ-অসৎ কাজে নিষেধ করা, অপরাধীকে আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তির আওতায় নিয়ে আসা কোন কিছুই সম্ভব নয়। উদাহরণ সরূপ: ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা না হলে আমাদের আলোচ্য কিতাবটির লেখকদের মত ইসলাম আর শরীয়ত বিরোধী আল্লাহর দুশমনদের রাষ্ট্রীয়ভাবে দমন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী জিহাদ পরিচালনা সম্ভব নয়, যার ফলে আহলে-কিতাব বা ইহুদী-নাসারাদের যিম্মী বানানো এবং তাদেরকে নতজানু করে জিযিয়া আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। যেখানে আল্লাহ ﷻ বলেন: {তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীনের অনুগত হয় না, যতক্ষণ না নতজানু হয়ে করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।} [আত-

তাওবাহ: ২৯]

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের বিপরীত হলো কুফরি রাষ্ট্র। যদি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে কুফরি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র আর কুফরি রাষ্ট্রের মধ্যে "আধা-ইসলামী আধা-কুফরি" রাষ্ট্র বলতে ইসলামে কিছুর অস্তিত্ব নেই। কুফরি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা মুসলিমদের এবং তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কারণ প্রতিটি রাষ্ট্রই তাদের মতবাদকে প্রচার এবং প্রসারের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাই নিশ্চিতভাবে কুফরি রাষ্ট্র তার মতবাদকে মুসলিমদের মধ্যে প্রচারে জন্য কলম আর তরবারি দুটোরই ব্যবহার করবে কিন্তু তাকে দমন করা সম্ভব হবে না। তারা শিক্ষা ব্যবস্থাতে নিজেদের মতো করে সাজাবে, যেখানে মুসলিমদের শিশুদের জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মত গোমরাহীপূর্ণ কুফরি দ্বীনের শিক্ষা প্রদান করবে। তারা আল্লাহর বিধানকে বাতিল বলে ঘোষণা করবে এবং নিজের মনগড়া বিধান আর সংবিধান তৈরি করবে। সেখানে ইসলামী কোন আদালত থাকবে না তাই তাগূতরা অধিকার আদায়ের স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে বিচারের ব্যাপারে আল্লাহর সাথে শিরক করানো মাধ্যমে দ্বীন থেকে বের করে নিবে। উপরোক্ত এই উদাহরণগুলো কোন সম্ভাবনা নয় বরং ইতিমধ্যে বাংলার মুসলিমদের উপর আপতিত এক ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা। বস্তুত: একটি ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া গুটি কতেক ব্যক্তিগত ইবাদত ছাড়া দ্বীনের সিংহভাগ হুকুম-আহকামই বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আল্লাহ ﷻ বলেন: {তোমরা কি কিতাবের (কোরআন) কিছু অংশের উপর ঈমান আনো এবং কিছু অংশের ব্যাপারে কুফরি করো? যারাই এমনটা করবে দুনিয়াতে তাদের জন্য অপমান-অপদস্থতা ছাড়া আর কিছুই নেই, এবং কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন আজাবের দিকে তাড়িত করা হবে।} [আল-বাক্বারাহ: ৮৫] ওয়াল্লাহুল মুস্তায়ান।

হুকুমের মালিক একমাত্র আল্লাহ

ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে নিয়ে মনগড়া শিশুসুলভ বক্তব্যে পর {হুকুম প্রদান করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর} [ইউসুফ: ৪০] – এই আয়াতের জন্য ব্যাখ্যায় তারা আশরাফ আলী থানভীর বক্তব্য নিয়ে এসেছে। তারা লিখেছে *"সন্ত্রাসীদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি মূলত বিভ্রান্ত খারেজী সম্প্রদায়ের কথা। আয়াতে মূলত বোঝানো হয়েছে যে, হুকুম বা*

শরীয়তের বিধান দেয়ার অধিকার কেবল আল্লাহ তা'আলাই রাখেন, অন্য কেউ নন। অথবা এ আয়াতে প্রকৃতির মাঝে কেবল আল্লাহ তা'আলার হুকুমই চলে-এ কথাটি বোঝানো হয়েছে।" [পৃষ্ঠা ৪৫] বস্তুত এই আয়াতের সাথে শুধু মাত্র প্রকৃতির সাথে যুক্ত করার এই তাফসীরটি অগ্রহণযোগ্য এবং তাফসীরের মূলনীতি বিরোধী। আল্লাহ ﷻ কোরআনুল কারীমের বলেন {আমি একে আরবি ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।} [ইউসুফ: ২] আল্লাহ ﷻ কোরআনকে পরিষ্কার আরবি ভাষায় নাজিল করেছেন, তাই আরবি ভাষায় যখন কোন আয়াত নাজিল হয় তখন সেই আয়াতের বাহ্যিক অর্থই হবে আয়াতের তাফসীর যদি না এই বাহ্যিক অর্থকে অন্য কোন কোরআন-সুন্নাহর দলীল বা আয়াত নাজিল হওয়ার শানে নুযূল কোন নির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ حكم শব্দের ব্যবহার করেছেন, আরবিতে যার অর্থ হলো قضاء বা বিচার-ফয়সালা, قيادة বা নেতৃত্ব, সরকার, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। তাছাড়া, কোরআন সুন্নাহর কোথাও এই আয়াতকে বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিষয়াদির সাথে যুক্ত করার দলীল পাওয়া যায় না, তাই এই তাফসীরটি একটি ফাসিদ বা ভুল তাফসীর। এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম আবু জাফর আত-তাবারী رحمه الله তার তাফসিরে বলেন, "(হুকুম প্রদান করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না) অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, আর তিনিই আদেশ করেছেন যাতে তোমরা ও তাঁর সমস্ত সৃষ্টি জীব একমাত্র ঐ আল্লাহরই ইবাদত কর, মা'বূদ ও ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা যার নিরঙ্কুশ অধিকার, অন্য কোন কিছু নয়।" [তাফসীর আত-তাবারী] এই মর্মে কোরআনুল কারীমে আরও একাধিক আয়াত রয়েছে। আল্লাহ ﷻ বলেন: {নিজের হুকুমে তিনি কাউকে শরিক করেন না।} [আল-কাহফ: ২৬] তিনি আরও বলেন: {শুনে রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা।} [আল-আরাফ: ৫৪] এই আয়াত সমূহ স্পষ্ট দলীল যে সর্ব প্রকার হুকুম আহকাম আর শরীয়ত প্রদান করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর, যারা তার এই অধিকারকে খর্ব করে নিজে থেকে বিধান তৈরি করবে, তারা তাগূত এবং যারা সেই তাগূতকে মান্য করবে তারা মুশরিক।

তাগূত

তাগূত হচ্ছে সেই ব্যক্তি বা বস্তু যাকে আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদত করা হয়। তাগূতের সংজ্ঞা দিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمه الله বলেন: "তাগুত হল (আল্লাহ ব্যতীত)

প্রত্যেক এমন ইলাহ কিংবা অনুসরণীয় বা মান্যব্যক্তি (বা বস্তু) যার ব্যাপারে বান্দা সীমালঙ্ঘন করে। সুতরাং প্রত্যেক কওমের তাগূত হল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ছেড়ে যার কাছে তারা বিচার তালাশ করে অথবা আল্লাহকে ছেড়ে তারা যার ইবাদত করে কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার নির্দেশনা ছাড়া যার অনুসরণ করে, অথবা কোন বিষয় আল্লাহর আনুগত্য করা যাবে কিনা তা না জেনেই তারা যার আনুগত্য করে। সুতরাং এরা হল বিশ্বের তাগূতের দল। যদি আপনি তাদের অবস্থা চিন্তা করেন ও তাদের সঙ্গে মানুষের অবস্থা চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে, অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে তাগূতের ইবাদতে লিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে বিচার পেশ করা বাদ দিয়ে তাগূতের কাছে বিচার পেশ করছে এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের অনুসরণকে উপেক্ষা করে তাগূত ও তার অনুসরণের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।" [ই'লামূল মুওয়াক্কিয়ীন]

আলোচ্য কিতাবটিতে তারা বার বার তাগূতের দালাল মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা, তাদের বিচারকদের হত্যা করা ইত্যাদির সাথে মুসলিমদের রক্ত প্রবাহিত করার বিধানকে জুড়ে দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছে। বস্তুতঃ যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোকের এই সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিৎ যে, বর্তমান জামানার যত তাগূত আছে তারাদের মূল ভরসা হলো তাদের বাহিনীগুলো: পুলিশ, সেনাবাহিনী, র‍্যাব, সোয়াত আরও যা যা আছে। কারণ এরাই তাদের সেনা, তাদের ঢাল, তাদের পেশি। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এরাই তাদের বর্শার ফলা। তাই, তাদের হত্যার সাথে মুসলিমদের রক্ত হারাম হওয়ার বিধানকে জুড়ে দেয়া হাস্যকর এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য। আল্লাহ ﷻ তার কোরআনে তাগূতের জন্য যুদ্ধকারীদের কাফির বলে সম্বোধন করেছেন। আল্লাহ ﷻ বলেন: {যারা ঈমান আনে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহে, আর যারা কাফির তারা যুদ্ধ করে তাগূতের জন্য। অতঃপর, তাগূতের মিত্রদের সাথে যুদ্ধ করো, নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত অতিব দুর্বল।} [আন-নিসা: ৭৬]

অতঃপর আল্লাহর দুশমন দরবারী আলেমরা আল্লাহর কিতাব নিয়ে তাদের মিথ্যাচারের এই পর্যায়ে কোরআনুল কারীমের বরকতময় আয়াত, {যারা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তা দ্বারা বিচার করে না, তারাই কাফির} [আল-মায়িদাহ: ৪৪] এর অর্থকে বিকৃত করে তাদের প্রভু তাগূত সরকারকে রক্ষা করা আর মানুষকে গোমরাহ করার প্রচেষ্টা চালায়। তারা বিভিন্ন উলামাদের খণ্ড খণ্ড বক্তব্যকে উল্লেখ করে দাবি করে যে, *"প্রখ্যাত সাহাবী হযরত হুযাইফা ইবনে আরাত (রা.) তাবেয়ী হযরত হাসান বাসরি (রহ.)-কে বলেন, এই আয়াতটি হলো ইয়াহুদিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুসলিমরা*

এর অন্তর্ভুক্ত নয়।" [পৃষ্ঠা ৭] এখানে তারা বাতিলের অনুসারিদের চিরাচরিত পন্থাকেই অবলম্বন করেছে। বাতিলের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হলো তারা তাদের মতামতকে সত্য প্রমাণ করার জন্য একমাত্র সেই সকল সালাফদের বক্তব্যকে প্রকাশ করবে যা তাদের স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে আসে। তাছাড়া তারা ইমামদের বক্তব্যের অংশ বিশেষকে প্রকাশ করে আর বাকি অংশকে গোপন করে। তারা তাদের এই দাবীর দলীল হিসেবে ইমাম ইবনে কাসির ﵀ এর তাফসিরের অংশ বিশেষ তুলে নিয়ে আসে যেখানে তিনি বলেন, *"বিশুদ্ধ কথা হলো, এ-আয়াত দুজন ইয়াহুদি প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে, যারা ব্যভিচার করেছিল এবং এ উভয়ের [বিচারের] ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর কিতাব [তাওরাত] তাদের নিজেদের হস্তে পরিবর্তন করেছিল ও বিকৃতি করেছিল। এ বিষয়ে বহুসংখ্যক হাদিস রয়েছে।"* [পৃষ্ঠা ৭]

বস্তুত, এ আয়াতের ব্যাপারে অধিকাংশ সালাফ এবং ইমামদের মত হলো তা শুধুমাত্র ইহুদীদের জন্য নির্দিষ্ট নয়। প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুদাইফাহ ইবনুল ইয়ামান, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵃ এই মত পোষণ করেন, তাছাড়া হাসান আল বাসরি, ইব্রাহীম আন-নুখাঈ, ইমাম আশ-শাওক্কানী, ইমাম ইবনে কাসির ﵏ প্রমুখও একই মত পোষণ করেন। এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে শানে নুযূল এবং বিভিন্ন বক্তব্যকে উল্লেখ করে ইমাম ইবনে কাসির ﵀ তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে বলেন: "অতঃপর যারা আল্লাহর শরীয়ত এবং তাঁর অবতারিত ওহী অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদের কাফির বলা হয়েছে। এ আয়াতটি মুফাসসিরদের উক্তি অনুযায়ী শানে নুযূল হিসেবে আহলে কিতাবের ব্যাপারে অবতীর্ণ হলেও হুকুমের দিক দিয়ে এটা সমস্ত লোকের ব্যাপারেই প্রযোজ্য। এটা বনী ইসরাইলের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছিল বটে; কিন্তু এ উম্মতের জন্যও এটাই হুকুম।" যেমনটি আমরা বলেছিলাম যে তারা ইমামদের বক্তব্যের কিছু অংশকে প্রকাশ করে এবং অংশকে গোপন করে, তারা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাসিরের ততটুকু অংশই ব্যবহার করেছে যা তাদের স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে লেগেছে। আবার তারাই মুজাহিদগণের উপর অপবাদ দেয় যে মুজাহিদগণ *"কখনো কখনো কুরআনের আয়াত, হাদিস বা সীরাতের একটি সাময়িক বিধান বা বিচ্ছিন্ন অংশ বিশেষ ব্যক্তির জন্য বিশেষ নির্দেশনা উল্লেখ করে অথবা আয়াত-হাদীসের একাংশ ব্যবহার করে এবং অন্য অংশ গোপন করে তাদের টার্গেট অনুযায়ী সদস্যদের মগজ ধোলাই করে।"* [পৃষ্ঠা ৪] যাই হোক, উসুল এবং ভাষাগত দিক থেকেও ইমাম ইবনে কাসির ﵀ এর বক্তব্যই সঠিক, কেননা উসুল হলো العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (কোন আয়াতের প্রয়োগ তার শানে নুযুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তার সাধারণ অর্থ অনুসারে হবে)। তাছাড়া এই আয়াতে من শব্দের ব্যবহার

করেছে যা صيغة العموم বা সমষ্টি বাচক শব্দ যা সামষ্টিকভাবে সবাইকে নির্দেশ করে, কোন নির্দিষ্ট দল বা সম্প্রদায়কে নয়। তাছাড়া তারা ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী ﵀ এর উদ্ধৃতি দিয়ে দাবি করে যে, "অর্থাৎ কোনো মুসলিম যদি আল্লাহর হুকুমকে অস্বীকার না করে কিন্তু তদনুযায়ী আমল করতে না পারে তবে গুনাহগার হবে কিন্তু কাফির হবে না এবং তাকে কাফির আখ্যায়িত করে হত্যাও করা যাবে না।" [পৃষ্ঠা ৯] ইমাম রাযী ﵀ এর ব্যাপারে সর্বজনবিদিত যে তিনি আক্বিদাগত দিক থেকে প্রথমে মু'তাজিলাহ ফিরকার অনুসারী ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি তাওবাহ করেন, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন এবং তার উপর রহম করুন।

এই আয়াতের ব্যাপারে কোন কোন সালাফের বক্তব্যকে অপব্যবহার করে দরবারীরা আলেমরা তাগূতদের রক্ষা করার জন্য যুগ যুগ ধরেই সন্দেহের পাহাড় তৈরি করেছে। এই ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত না গিয়ে আমরা তাফসির ইবনে কাসির থেকে সংক্ষেপে এই আয়াতের মর্মার্থ তুলে আনবো, কারণ আমাদের আলোচ্য কিতাবটিতেও তারা ইবনে কাসির ﵀ এর উদ্ধৃতি দিয়েছে, যার দ্বারা তারা তাকে গ্রহণযোগ্য ইমাম হিসেবে মানে বলে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া আমরা ইমাম ইবনে কাসির এবং তার শিক্ষক শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ﵀ এর বক্তব্যকে এই কারণে ব্যবহার করবো যে, তারা যে যুগে বাস করেছেন এবং দ্বীনের চর্চা করেছেন তৎকালীন মুসলিম উম্মাহ সমকালীন মুসলিম উম্মাহর মতই মানব রচিত বিধান দ্বারা শাসনকারী নামধারী মুসলিম তাগূতদের ফিতনার সম্মুখীন হয়েছিল। তারা তাতারদের আগ্রাসনের জামানায় ছিলেন, বলা হয় যে, তাতাররাই প্রথম আল-ইয়াসিক্ব নামক একটি মানব রচিত বিধান নিয়ে আসে। সূরা আল আল-মায়িদাহ এর সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহের ব্যাপারে সালাফদের বক্তব্য এবং বিভিন্ন দলীল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে ইমাম ইবনে কাসির তাতারদের বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য আহ্বান করে বলেন: "যেমন জাহেলিয়্যাতের অনুসারী এবং গুমরাহ সম্প্রদায় নিজেদের মত ও মর্জি মোতাবেক হুকুম আহকাম জারী করতো এবং তাতারিরা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য চেঙ্গিস খানের হুকুমের অনুসরণ করতো, যা আল-ইয়াসিক্ব তৈরি করে দিয়েছিল। ওটা ছিল বহু সম্মিলিত আহকামের দফতর, যা বিভিন্ন শরীয়ত ও মাযহাব হতে বাছাই করে নেয়া হয়েছিল। ওটা ছিল ইয়াহূদী, নাসরানী এবং ইসলামী ইত্যাদি বিধান সমূহের সমষ্টি, আবার তাতে এমনও কতক আহকাম ছিল যা শুধুমাত্র জ্ঞান, মত আর চিন্তা দ্বারা আবিষ্কার করা হয়েছিল এবং যার মধ্যে প্রবৃত্তিরও সংযোগ ছিল। সুতরাং ঐ সমষ্টিই তাদের সন্তানদের নিকট আমলের যোগ্য বিবেচিত হতো এবং ওকেই তারা কিতাব ও সুন্নতের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়ে দিলো। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কার্য সম্পাদনকারীরা কাফির এবং তাদের বিরুদ্ধে

জিহাদ করা ওয়াজিব। যে পর্যন্ত তারা ঐসব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর দিকে প্রত্যাবর্তন না করে এবং যে কোন ছোট, বড়, গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ ব্যাপারে কিতাব ও সুন্নত ছাড়া অন্য কোন হুকুম গ্রহণ না করে।" [তাফসীর ইবনে কাসির]

ইকামাতুদ দ্বীন ও "বিধান দেয়ার একমাত্র অধিকার আল্লাহর" বিষয়ক উপরে উল্লেখিত আলোচনা, অতঃপর সূরা আল-মায়িদাহ'র উপরোল্লিখিত বরকতময় আয়াত সমূহের ভিত্তিতে কোন অন্ধেরও অস্বীকার কারার কোন অজুহাত নেই যে বাংলার সরকার আল্লাহর দ্বীন কায়েমের পথে প্রধান শত্রু, আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে তাগূতের পরিণত হওয়া এবং আল্লাহর নাজিল কৃত বিধান ত্যাগ করে বিচার করার মাধ্যমে কাফির-মুরতাদের পরিণত সরকার। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক সক্ষম মুসলিমের উপর ওয়াজিব। তাছাড়া, আমরা আরও বলতে চাই যে, উপরোক্ত আয়াত সমূহ ছাড়াও এই সরকারের দ্বীন ত্যাগের কয়েকশ' কারণ রয়েছে কারণ তারা কুফরের এমন কোন পথ নেই যাতে পা দেয় নি আর এমন কোন দরজা নেই যাতে প্রবেশ করেনি। যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করা ওয়াজিব তখন তাদের বক্তব্য *"এমনকি যদি কেউ বিধি মোতাবেক কাফির আখ্যায়িতও হয় তবুও তাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে হত্যা করা বিহিত নয়।"* [পৃষ্ঠা ৯] এর কোন মূল্যই থাকে না।

তারা *"মুসলিম শাসকগণ সম্পর্কে আইএস চরমপন্থিদের অপব্যাখ্যা"* এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছে: *"মুসলিম বিশ্বের শাসকবর্গ নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিলে তারা কাফের নন। কোন মুসলিম পাপ করলে কাফের হয় না এবং ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় না।"* [পৃষ্ঠা ৪৪] এখানে তাদের দাবী হলো কেউ নিজেকে মুসলিম পরিচয় দিলে সে কাফির হতে পারে না, অর্থাৎ ইসলাম একটি দাবি সর্বস্ব বিষয়। তাদের এই বক্তব্য চরম গোমরাহি পূর্ণ, কারণ ইসলাম শুধু মুখের দাবি নয়। এই ব্যাপারে দলীল হলে আল্লাহ ﷻ এর ইরশাদ: {এবং মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে আমরা ঈমান এনেছি, কিন্তু আসলে তারা মুসলিম নয়।} [আল-বাক্বারাহ: ৮] আল্লাহ ﷻ আরও বলেন: {আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে? আর ওজর পেশ করো না, তোমরা যে কাফির হয়ে গেছ ঈমান প্রকাশ করার পর।} [আত-তাওবাহ: ৬৫-৬৬] এই আয়াত সমূহ ঘোষণা করা হয়েছে যে মুখের দাবি দ্বারা কেউ মুসলিম হয় না। এই ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের বক্তব্য হলো: "এমন ব্যক্তি যে শাহাদাতাইন (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ – মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) উচ্চারণ করে, বাহ্যিক ভাবে

নিজেকে মুসলিম হিসেবে প্রকাশ করে এবং ইসলাম ভঙ্গকারী কোন কিছুর সম্পাদন করে না, তাকে আমরা মুসলিম হিসেবেই গণ্য করি এবং তার গোপন বিষয় আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেই।" [এই আমাদের আক্বিদাহ, এই আমাদের মানহায]

বস্তুতঃ নামধারী মুসলিম শাসকদের আমরা এই কারণে কাফির ঘোষণা করি না যে তারা পাপে লিপ্ত, বরং তাদের কাফির ঘোষণা করার কারণ হলো তারা একাধিক ইসলাম ভঙ্গকারী কাজের সম্পাদনকারী, আর এ ব্যাপারে কোরআন এবং সুন্নাতে অসংখ্য দলীল রয়েছে যা দাওলাতুল ইসলাম এর মিডিয়া দিওয়ান কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনায় প্রকাশ করা হয়েছে। আর দ্বীনত্যাগী মুরতাদ তাগূতী সরকারের আইন কানুন আর বিধানের সাথে তাওহীদবাদীদের দুশমনি ছাড়া আর কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যেখানে ফরজ সেখানে তাদের আইন মানার দাবী একটি হাস্যকর এবং অবাস্তব দাবী। এই ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের মন্তব্য হলো: "একজন কাফির কখনও ইমাম (রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী) হতে পারবে না, আর যদি কোন ইমাম কুফরে পতিত হয় তাহলে তার ক্ষমতা বাতিল হয়ে যায় এবং তার আনুগত্য করা আর আবশ্যক থাকে না। তদুপরি তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা, তাকে ক্ষমতা থেকে সরানো এবং একজন ন্যায় পরায়ণ ইমাম নিযুক্ত করা মুসলিমদের উপর সাধ্যানুযায়ী ওয়াজিব হয়ে যায়।" [এই আমাদের আক্বিদাহ, এই আমাদের মানহায]

অতঃপর তারা কোরআনুল কারীমের অপর একটি আয়াতের অর্থকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। আল্লাহ ﷻ বলেন: {অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার (আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া) মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।} [আন-নিসা: ৬৫] এই আয়াতের ব্যাপারে তাদের বক্তব্যের দিকে যাওয়ার পূর্বে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি গোচর করবো। এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ আল্লাহর শরীয়তের বিধানকে মেনে নেয়াকে ঈমানের একটি শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, এবং যারা তাঁর শরীয়তের বিচারের বদলে অন্য বিচার ব্যবস্থার কাছে বিচার প্রার্থনা করবে তাদেরকে কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাছাড়া আল্লাহ ﷻ বলেন: {তারা বলে: আমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আনুগত্য করি; কিন্তু অতঃপর তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তারা মুমিন নয়। তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে আহবান করা হয তখন তাদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়।} [আন-নূর: ৪৭-৪৮] এই আয়াত দুটোর ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনে

কাসির কোরআনের অপর একটি আয়াত নিয়ে আসেন। আল্লাহ ﷻ বলেন, {আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আমরা ঈমান এনেছি যা আপনার এবং আপনার পূর্ববর্তীগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। (তা সত্ত্বেও) তারা তাগূতের কাছে বিচার চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাগূতের কে প্রত্যাখ্যান করে। আর শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রাসূলের দিকে আসো, তখন মুনাফিকদেরকে তুমি তোমার নিকট হতে মুখ একবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে।} [আন-নিসা: ৬০-৬১] অতঃপর তিনি বলেন: "ঘোষিত হচ্ছে: যদি তাদের প্রাপ্য থাকে তাহলে তারা বিনীতভাবে রাসূল ﷺ এর নিকট ছুটে আসে। অর্থাৎ তারা যদি শরীয়তের ফায়সালায় নিজেদের লাভ দেখতে পায় তবে আনন্দে আটখানা হয়ে রাসূল ﷺ এর নিকট ছুটে আসে। আর যদি জানতে পারে যে, শরঈ ফায়সালা তাদের মনের চাহিদার উল্টো, পার্থিব স্বার্থের পরিপন্থী, তবে তারা সত্যের দিকে ফিরেও তাকায় না। সুতরাং এইরূপ লোক পাক্কা কাফির।" [তাফসীর ইবনে কাসির] কোরআনের এই আয়াত সমূহ আল্লাহর শরীয়তের বিধানের কাছে মানুষের আত্ম-সমর্পণের গুরুত্বকে বর্ণনা করে, যে ব্যাপারে বাংলার সাধারণ মুসলিমরা বড়ই উদাসীন। আল্লাহ ﷻ তাঁর শরীয়তের বাহিরে অন্য শরীয়তের কাছে বিচার প্রার্থনাকারীকে যেমন কাফির বলে নির্ধারিত করেছেন ঠিক তেমনি তিনি ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন: {মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই, যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহবান করা হয়, তখন তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম।} [আন-নূর: ৫১] অর্থাৎ যারা আল্লাহর শরীয়তের বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করে তারাই মুমিন এবং তারাই সফলকাম। আল্লাহ আমাদের দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং হক-বাতিলের মধ্যকার পার্থক্যকে পরিষ্কার করে দিন।

অতঃপর, উপরের আয়াতগুলো পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, যারা আল্লাহর বিধানের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে না এবং তাগূতের কাছে বিচার চায় তারা কাফির, এমনটাই আল্লাহর বিধান। আমাদের আলোচ্য কিতাবটিতে বাতিলের প্রহরীরা এই আয়াতকে উল্লেখ করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে বলেছে *"আর শাস্তি বাস্তবায়নের যথাযথ কর্তৃপক্ষ ব্যতীত কেউ যাতে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয় সেজন্য পরবর্তী আয়াতে এর থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তাই এ আয়াতটির প্রেক্ষাপট উল্লেখ করে কেউ কেউ আইনকে নিজ হাতে তুলে নেয়ার বৈধতার পক্ষে দলিল পেশ করেন। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।"* [পৃষ্ঠা ৪৭] বলা বাহুল্য,

মুরতাদদের রক্তের কোন মূল্য নেই, রাসূল ﷺ বলেন: {যে তার দ্বীনকে পরিবর্তন করলো তাকে হত্যা করো।} [বুখারী] আর তাগূতের আইন মানার ব্যাপারে মুসলিমদের কোন বাধ্যবাধকতা নেই, বরং তাদের সাথে যুদ্ধ করে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা ফরজ। তাই আইন হাতে তুলে নেয়া উচিৎ নয় কথাটা কতটুকু কোরআন সম্মত তা যে কোন সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরই বুঝে নেয়া উচিৎ।

দারুল হারব এবং দারুল ইসলাম

এই পর্যায়ে আমরা দারুল হারব এবং দারুল ইসলাম নিয়ে তাদের নির্লজ্জ মিথ্যাচারের দিকে আলোকপাত করবো। আল্লাহর দুশমন মিথ্যাচারের সওদাগররা বাংলার সাধারণ মুসলিমদের অতি সাধারণ এবং প্রাথমিক ইসলামী জ্ঞানের অভাবকে কাজে লাগিয়ে ইসলামের এমন কিছু পরিভাষাকে পরিবর্তনের প্রয়াস চালিয়েছে যা আমাদের পূর্ববর্তী মুসলিমদের কাছে অতি পরিচিত ছিল। আর সে রকমই দুটি পরিভাষা হলো দারুল ইসলাম এবং দারুল হারব। তারা তাদের কিতাবে দারুল হারব এবং দারুল ইসলামের সংজ্ঞা দিয়ে বলেছে: *"দারুল ইসলাম বলতে বোঝায় যে রাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে এবং মুসলিমগণ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করছে। দারুল হারব বা দারুল কুফর বলতে ঐ রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে অমুসলিমদের সংখ্যাধিক্য রয়েছে।"* [পৃষ্ঠা ৪৯] অর্থাৎ তাদের মতে দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফর নির্ধারিত হয় সংখ্যার ভিত্তিতে, যদি কোন দেশে মুসলিম সংখ্যায় অধিক হয় তাহলে সেটাই দারুল ইসলাম। এই দলীলের ভিত্তিতেই তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং বাংলাদেশ নামক ক্রুসেডারদের টেবিলে কাগজ আর পেন্সিলে আঁকা মানচিত্রের সীমানায় বন্দী তাগূতী রাষ্ট্রকে দারুল ইসলাম বলে প্রচার করে।

ইবনুল ক্বাইয়্যিম ﵀ বলেন: "জুমহুর (অধিকাংশ) উলামাদের মতে, 'দারুল ইসলাম হলো সেই জায়গা যেখানে মুসলিমরা বসবাস করে এবং সেখানে ইসলামের বিধান জোরদার। যদি মানুষ একটি ভূমিতে বাস করে এবং সেখানে ইসলাম আধিপত্যশালী হয়, তখনই সেটা দারুল ইসলাম। তদুপরি, ইসলাম আধিপত্যশালী নয় কিন্তু দারুল ইসলামের নিকটবর্তী, এমন ভূমি দারুল ইসলাম হবে না। তায়েফ মক্কার (মক্কা দারুল ইসলামের পরিণত হওয়ার পর) নিকটেই ছিল, কিন্তু বিজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তা দারুল ইসলামের অংশ হয় নি।'" [কিতাব আহকাম আহলুয যিম্মা]

হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলেম ইবনে মুফলিহ ﵀ বলেন: "মাত্র দুই ধরণেরই ভূমি আছে, দারুল ইসলাম এবং দারুল কুফর। যে ভূমিতে ইসলামের বিধান জোরদার সে ভূমি হলো দারুল ইসলাম এবং যে ভূমিতে কুফরের বিধান জোরদার সেটা হলো দারুল কুফর।" [আল-আদাব আশ-শরীয়াহ]

হানাফি মাযহাবের ইমাম আল-খাসানী ﵀ বলেন: "হানাফি মাযহাবের আলেমগণের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই যে যখন কোন ভূমিতে ইসলামের বিধান আধিপত্যশালী হয়

তখন তা দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামের পরিণত হয়।” [বাদাউস সানাই] একই মর্মে অন্যান্য উলামাগণের একাধিক বক্তব্য রয়েছে।

অর্থাৎ দারুল ইসলাম হলো সেই ভূমি যেখানে আল্লাহর দ্বীন শক্তিশালী, শরীয়তের বিধান প্রতিষ্ঠিত এবং মুসলিমরা বিজয়ী। এখানে সংখ্যার ভূমিকা নেই। উদাহরণ সরূপ, স্পেন বা আন্দালুস সহ অন্যান্য কাফিরদের ভূমি জয় করে শরীয়তের বিধান চালু করার সাথে সাথেই তা দারুল ইসলাম বলে পরিগণিত হয়, যদিও সেখানে মুসলিমদের চেয়ে কাফিরদের সংখ্যাই অধিক ছিলো। বিষয়টি পরিষ্কার যে দারুল ইসলাম আর দারুল কুফরের মাপকাঠি হলো শরীয়ত, সংখ্যা নয়। এখন দেখা যাক এই ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের বক্তব্য কি: “আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি কোন ভূমিতে কুফরের বিধান ক্ষমতাসীন হয় এবং ইসলামের বিধানের উপর কুফরের বিধান বলবত হয়ে যায়, তাহলে সে ভূমি হলো দারুল কুফর, কিন্তু এর ভিত্তিতে সেই ভূমিতে বসবাসরত সবাইকে তাকফির করিনা। আমরা গুলাতদের (দ্বীনের ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বনকারী) মত বলি না, “মানুষের আসল অবস্থা হলো যে তারা সম্পূর্ণ কাফির”, বরং প্রত্যেক মানুষ তার নিজেরে অবস্থা অনুসারে মূল্যায়ন করা হবে এবং মানুষের মধ্যে মুসলিম এবং কাফির দুই ধরণের লোকই আছে। আমরা বিশ্বাস করি যে গণতন্ত্র ও সকল প্রকার ধর্মনিরপেক্ষতা – যেমন জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ, কমিউনিজম এবং বাথিজম – পরিষ্কার কুফর যা একজনের ইসলামকে বাতিল করে মিল্লাত থেকে বের করে দেয়।” [এই আমাদের আক্বিদাহ, এবং এই আমাদের মানহায]

উপরোক্ত আলোচনা অনুসারে বাংলাদেশ নামক মানুষের তৈরি সীমান্তের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, মানব রচিত বিধান দ্বারা চালিত রাষ্ট্র কোন ভাবেই দারুল ইসলাম বলে বিবেচিত হতে পারে না। বরং, বাংলাদেশ হলো দারুল কুফর এবং এর রাষ্ট্রযন্ত্র ও এর রক্ষকদের সাথে যুদ্ধ করে আল্লাহর দ্বীনকে বুলন্দ করা এবং আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরয। অপর দিকে, সম্পূর্ণ পৃথিবীতে একমাত্র দারুল ইসলাম হলো ইরাক, শাম এবং খোরাসানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে খিলাফত রাষ্ট্র তথা দাওলাতুল ইসলামের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি সমূহ। কারণ সেখানে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত, শরীয়তের বিধান বাস্তবায়িত। সেখানে ইসলামের প্রতিটি বিষয়কে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। সেখানে আল্লাহর দুশমন কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়, রাসূল ﷺ এর অবমাননাকারীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। দাওলাতুল ইসলাম হচ্ছে এমন রাষ্ট্র যার প্রতিটি বিভাগ ও দিওয়ান আল্লাহর বিধান দ্বারা পরিচালিত, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অর্থনীতি, বিচার-শালিস থেকে পররাষ্ট্র নীতি সবই। এ রাষ্ট্র কাফিরদের বন্ধু

হিসেবে গ্রহণ করে না, আহলে কিতাবের যে সকল লোক জিযিয়া প্রদান করে তাদের নিরাপত্তা প্রদান করে, দাওলাতুল ইসলাম সর্বক্ষেত্রে কাফিরদের উপর মুসলিমদের প্রাধান্য দেয়। তাই বাংলা সহ পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলিমদের অবশ্য কর্তব্য হলো এই রাষ্ট্রকে সহায়তা করা এবং এর দুশমনদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা। যাদের পক্ষে সম্ভব তাদের অবশ্যই দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে হিজরত করতে হবে, আল্লাহ ﷻ বলেন: {যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে: এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে: আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা হিজরত করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।} [আন-নিসা: ৯৭] আর না হলে যা আছে তাই নিয়েই আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যাতে নিজের ভূমিতে খিলাফাহ'র শাসনকে বিস্তৃত করা যায়। আল্লাহ আমাদের সঠিক দ্বীনের রাস্তা প্রদর্শন করুন এবং হকের উপর অটল রাখুন।

বাইয়াহ

ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যাপারে কথা বললে যে বিষয়টি সরাসরি চলে আসে তা হলো বাইয়াহ বা অঙ্গীকারের শপথ। তাগূতের এজেন্ট এই বিষয় নিয়েও মিথ্যাচার না করে ক্ষান্ত হয় নি। তারা তাদের কিতাবের ৩৭ নাম্বার পৃষ্ঠায় দাবি করে যে, খিলাফাহ'র প্রতি বাইয়াহ প্রদান করার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে তারা কোন দলীল প্রকাশ করে নি, আর কারণটাও সহজ, বস্তুত এই বক্তব্যের ব্যাপারে তারা আমৃত্যু কোন দলীল নিয়ে আসতে পারবে না। তদুপরি, ইবনে উমর ﵄ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন: "যে আমীরের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যাবে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাত কবে যে তার কোন কৈফিয়ত থাকবে না। আর যে মৃত্যুবরণ করবে এমন অবস্থায় যে তার কাঁধে কোন বাইয়াহ নেই, তাহলে তার মৃত্যু জাহিলিয়্যাতের মৃত্যু।" [মুসলিম] আউনুদ্দিন ইবনে হুবাইরাহ ؒ এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: "আর যে মৃত্যুবরণ করবে এমন অবস্থায় যে তার কাঁধে কোন বাইয়াহ নেই - এর অর্থ হলো তার কোন ইমাম নেই, যা নির্দেশ করে শুরা করার জন্য নির্ধারিত তিন দিনের বেশি এমন কোন ইমামের বাইয়াহ ছাড়া থাকা জায়েজ নয়, যার কাছে তারা তাদের বিষয়াদির ব্যাপারে দ্বারস্থ হবে।" [আল-ইফসাহ আন মায়ানিল সাহাহ] এবং এই ব্যাপারে সাহাবিগণের ইজমা রয়েছে। এখানে পরিষ্কার যে খিলাফাহ ফিরে আসা এবং মুসলিমদের একজন সর্বজনীন ইমাম বা খলিফা নির্ধারিত হওয়ার পর খলিফা'র হাতে বাইয়াহ প্রদান করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ওয়াজিব। তবে কেউ যদি দাবি করে যে খিলাফাহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য জাতিসংঘ নামক তাগূতের বৈঠকখানার অনুমোদন লাগবে তাহলে তাদের জন্য তরবারির ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষাই মুজাহিদগণের জানা নেই।

আমীরের প্রতি আনুগত্য শর্তহীন?

আলোচ্য কিতাবে তারা লিখেছে: *"সন্ত্রাসবাদীরা দাবি করে ও বিশ্বাস করে যে, তাদের দলীয় ইমাম ও আমীরের শর্তহীন আনুগত্য করা ফরয।"* [পৃষ্ঠা ৩৪] কোথায় সন্ত্রাসবাদীরা এই দাবি করেছে তার কোন দলীল নেই, যাই হোক, দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ যখন খলিফা'র প্রতি বাইয়াহ প্রদান করেন তখন তাদের বাইয়াহ'র বাক্যে তারা বলেন, "আমরা আমিরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মুসলিম আবু বকর আল বাগদাদী আল হুসাইনী আল কোরাইশীকে এই মর্মে বাইয়াহ প্রদান করছি যে, আমরা তার কথা

শুনবো এবং মানবো... যদি না আমরা তার কাছ থেকে এমন কোন প্রকাশ্য কুফর প্রত্যক্ষ না করি যার ব্যাপারে আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের কাছে দলীল রয়েছে।" অর্থাৎ এখানে প্রথম শর্ত হলো কুফরির ক্ষেত্রে খলিফাহ'র আনুগত্য করা হবে না। দ্বিতীয়ত, খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর আল বাগদাদী (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) ১৪৩৫ হিজরি সনের রামাদান মাসের ৬ তারিখে প্রচারিত তার ঐতিহাসিক বক্তব্যে বলেন: "এ আমানতের (খিলাফাহ) গুরুভার আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এক ভারী আমানত, আমাকে আপনাদের নেতা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে, যদিও আমি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নই, না আমি আপনাদের চেয়ে উত্তম। তাই, যদি আপনারা আমাকে হকের উপর দেখেন, তবে আমাকে সাহায্য করবেন। আর যদি আমাকে বাতিলের উপর দেখেন, তাহলে আমাকে নসিহত প্রদান করবেন এবং আমাকে শুধরিয়ে দিবেন। যতক্ষণ আমি আল্লাহর আদেশ মান্য করি তখন আপনারা আমাকে মান্য করবেন, আর যদি আমি আল্লাহর অবাধ্য হই তাহলে সে কাজে আমি আপনাদের আনুগত্যের হকদার নই।" [মসুলে শহরের বড় মসজিদ থেকে জুমআর খুতবা ও সালাতের বিশেষ সম্প্রচার; আল ফুরক্বান মিডিয়া] অর্থাৎ দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণের বিরুদ্ধে তাদের এই বক্তব্যও একটি ভিত্তিহীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যা। আল্লাহ তাদেরকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিন, আমিন।

ইসলাম

আমাদের এই কিতাবের শুরুতেই আমরা আলোচনা করেছি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক ফ্রন্টে আল্লাহর দুশমনদের তৎপরতার কথা। বাংলার ভূমিতে জন্ম নেয়া মুসলিমদের জীবনের শুরু থেকেই একটি গৎবাঁধা বাক্য শিক্ষা দেয়া হয়, আর তা হলো "ইসলাম শান্তির ধর্ম"। আলোচ্য কিতাবটির মধ্যে এই বিষয়ের উল্লেখ প্রত্যাশিত ছিল, কারণ এই অস্ত্রের ব্যবহার তাদের জন্য যুগ যুগ ধরে ভালোই ফল নিয়ে এসেছে। আসবে নাই বা কেন? মুসলিমদের হৃদয়ে যখন দ্বীনের জ্ঞান আর আক্বিদার বর্ম থাকে না তখন কাগজের তরবারিই তাদের হৃদয়কে কচুকাটা করতে সক্ষম। তাদের বক্তব্য: *"ইসলাম রহমানুর রহীম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ও রহমাতুললিল 'আলামীন রাসূলুল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত এক উদার, সহনশীল ও অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। জীবনঘনিষ্ঠ এক মহান শান্তিবাদী জীবনব্যবস্থা। ইসলাম অতিশয় সহজ-সরল ও মানুষের স্বভাবানুকূল এক সহজাত বিধান।"* [পৃষ্ঠা ১] তাদের এই বক্তব্যকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তারা কোরআনের একটি বরকতময় আয়াতের অংশ বিশেষ নিয়ে আসে: {তিনি তোমাদের ওপর ধর্মের ব্যাপারে কোন সংকীর্ণতা রাখেননি।} [আল-হাজ্জ: ৭৮] এই আয়াতে আবারও الدين শব্দের অর্থ করা হয় "ধর্ম"। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি এই অনুবাদ অসম্পূর্ণ। যাই হোক, আল্লাহর ইচ্ছায় মিষ্টির সওদাগর দরবারী এই আলেমদের এই দাবির সত্যতা যাচাই করার কাজ আমরা তাদের উল্লেখিত এই আয়াত থেকেই শুরু করবো।

আল্লাহ ﷻ বলেন: {এবং আল্লাহর রাস্তায় ঠিক তেমন ভাবে জিহাদ কর, যেমনটা করা উচিৎ। তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং দ্বীনের ব্যাপারে তিনি কোন সংকীর্ণতা-কঠোরতা রাখেন নি। এটাই তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত। তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রাসূল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্য দাতা এবং তোমরা সাক্ষ্য-দাতা হও মানবমন্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মাওলা। অতএব তিনি কত উত্তম মাওলা এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।} [আল-হাজ্জ: ৭৮]

বরকতময় এই আয়াত থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে এই আয়াতটি বিশেষ করে মুসলিমদের জন্য। কারণ আল্লাহ ﷻ বলেছেন "তিনিই (আল্লাহ নিজে) তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলিম।" আল্লাহ ﷻ মুসলিম অবস্থায় আমাদের জন্য শাহাদাহ'র মৃত্যু নসীব

করুন। তারপর আল্লাহ ﷻ বলেন “দ্বীনের ব্যাপারে তিনি কোন সংকীর্ণতা-কঠোরতা রাখেন নি।” এই আয়াত حرج শব্দের ব্যবহার করা হয়, এর ভাষাগত অর্থ সংকীর্ণতা, কঠোরতা ইত্যাদি। ইসলাম শান্তির ধর্ম এই দাবীর সাথে এই আয়াতের সংযোগ কতটুকু আছে তা এর তাফসীর থেকেই বুঝা যাবে। ইমাম বাগ্বাওয়ী ﵀ তার তাফসীরে বলেন: “‘দ্বীনের ব্যাপারে তিনি কোন সংকীর্ণতা-কঠোরতা রাখেন নি’ (এখানে حرج এর অর্থ) সংকীর্ণতা। যার মানে; একজন মুমিন কখনই এমন কোন গোনাহ দ্বারা পরীক্ষিত হয় না, যার প্রায়শ্চিত্ত করার কোন রাস্তা আল্লাহ দেন নি, কোন গোনাহ’র জন্য তাওবাহই যথেষ্ট তো কোন গোনাহর জন্য অধিকার ফিরিয়ে দেয়া বা কিসাসের দরকার পড়ে, কোন কোন গোনাহ’র জন্য বিভিন্ন ধরণের কাফফারাহ রয়েছে। আল্লাহর দ্বীনে এমন কোন গোনাহ নেই যে কোন বান্দা এ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার রাস্তা খুঁজে পাবে না।” মুকাতিল ﵀ বলেন: “এর অর্থ; জরুরতের সময় নমনীয়তা, যেমন সফরে কসরের সালাত পড়া এবং তাইয়াম্মুম, জরুরতের সময় মৃত প্রাণীর গোসত খাওয়া, সফর ও রোগের সময় সাওম ভঙ্গ করা এবং অক্ষমদের জন্য বসে বা শুয়ে সালাত আদায় ইত্যাদি।” আল-কালবী ﵀ ও একই মত পোষণ করেন। [তাফসীর আল-বাগ্বাওয়ী]

ইবনে কাসির ﵀ তার তাফসীরে একই মত পোষণ করে বলেন: “রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মুয়াজ ﵁ এবং আবু মূসা ﵁ কে ইয়েমেনের আমীর নিযুক্ত করে পাঠান তখন তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন: ‘তোমরা মানুষকে সুসংবাদ দেবে, তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করবে না এবং এমন কাজের হুকুম করবে যা পালন করা তাদের পক্ষে সহজ সাধ্য হয়, কঠিন না হয়।’ এ বিষয় সম্পর্কীয় বহু হাদিস রয়েছে।” [তাফসীর ইবনে কাসির] অর্থাৎ এই আয়াতে দ্বীনে সংকীর্ণতা নেই এর মানে নয় যে এই দ্বীন কাফির মুশরিকদের জন্য উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ। দ্বীনে সংকীর্ণতা নেই এই ঘোষণা করার পর পরই আল্লাহ বলেন: “এটাই তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত।” আল্লাহ ﷻ কোরআনুল কারীমে বলেন: {তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করি। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা ও ঘৃণা থাকবে।} [আল-মুমতাহানাহ: ৪] এই আয়াত থেকে পরিষ্কার প্রকাশ পায় যে, মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম ﵇ আদৌও সহনশীল ও অসাম্প্রদায়িক ছিলেন না। তিনি তার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্যে শত্রুতা আর ঘৃণার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন, আর সেই শত্রুতা আর ঘৃণার সমাপ্তির শর্ত হিসেবে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনাকেই উল্লেখ করেছিলেন। তিনি তাদের ভালোবাসা, সহাবস্থান, পারস্পরিক সম্প্রীতির কথা

বলেন নি। আর তার এই আদর্শকেই আল্লাহ ﷻ "أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" বা "চমৎকার আদর্শ" বলে অবিহিত করেছেন। এই ছিল আল্লাহর নবী, মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম ﷷ এর মিল্লাত।

এই যখন আল্লাহর নবী ইব্রাহীম ﷷ এর আদর্শ তখন আল্লাহ ﷻ সর্বশেষ নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদ ﷺ এবং তার সাহাবিগণের আদর্শের বর্ণনা করে বলেন: {মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।} [আল-ফাতহ: ২৯] এই আয়াতের অর্থ মধ্য আকাশের সূর্যের মত পরিষ্কার। দুঃখজনকভাবে বাংলার ভূমিতে তথাকথিত ইসলামী ওয়াজ-মাহফিলের কখনই এই আয়াতগুলো বলতে শুনা যায় না। তারা আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের কাছ থেকে গোপন করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ এবং তার সাহাবীগণ মিল্লাতে ইব্রাহীমের উপর ছিলেন, আর উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহই তার সাক্ষ্য দেন। আল্লাহ ﷻ বলেন: {হে ঈমানদারগণ, তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন।} [আত-তাওবাহ: ১২৩] কাফিরদের প্রতি কঠোরতা আল্লাহর আদেশ এবং ঈমানের অঙ্গ।

আবু হুরায়রাহ ؓ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন: "তোমরা ইহুদী ও নাসারাদেরকে প্রথমে সালাম দিবে না এবং যদি পথে তোমাদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়ে যায় তবে তাদেরকে রাস্তার সংকীর্ণ অংশ দিয়ে যেতে বাধ্য করবে।" [মুসলিম] অর্থাৎ তাদের রাস্তার সংকীর্ণ অংশের দিকে ঠেলে দিবে। রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন মক্কার মুশরিকদের বলেন "নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জবাই করতে এসেছি।" [মুসনাদ আহমাদ]

আল্লাহ ﷻ কোরআনুল কারীমের বলেন: {হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই মুশরিকরা নাজাস (অপবিত্র)।} [আত-তাওবাহ: ২৮] এই আয়াতের ভিত্তিতে আমিরুল মুমিনিন উমার ইবনে আবদুল আজিজ ؒ আদেশ জারি করেন যে; ইহুদী নাসারাদের মুসলিমদের মসজিদে আসতে দেয়া হবে না। আল্লাহ ﷻ বলেন: {তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীনের অনুগত হয় না, যতক্ষণ না নতজানু হয়ে করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। } [আত-তাওবাহ: ২৯] আবদুর রহমান ইবনে গানাম আশআরী ؓ বলেন: "আমি নিজের হাতে চুক্তিনামা লিখে উমার ؓ এর নিকট পাঠিয়েছিলাম যে, শামের কয়েকটি শহরের নাসারাদের পক্ষ হতে এই

চুক্তিনামা আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনীন উমার ﷺ এর প্রতি। চুক্তিপত্রের বিষয়বস্তু হচ্ছে: যখন আপনারা (মুসলিমরা) আমাদের উপর এসে পড়লেন (অর্থাৎ আমাদের উপর বিজয় লাভ করলেন), আমরা আপনাদের নিকট আমাদের জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। আমরা নিম্নোক্ত শর্তাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে এই নিরাপত্তার প্রার্থনা করছি: আমরা এই শহরগুলোতে এবং এগুলোর আশে পাশে নতুন কোন মন্দির, গির্জা এবং খানকা নির্মাণ করবো না। এরূপ কোন ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের মেরামত ও সংস্কারও করবো না। এসব ঘরে যদি কোন মুসলিম মুসাফির অবস্থানের ইচ্ছা করেন তবে আমরা তাদেরকে বাধা দেবো না। তারা রাত্রে অবস্থান করুন বা দিনেই অবস্থান করুন। আমরা পথিক ও মুসাফিরদের জন্য ওগুলোর দরজা সব সময় খুলে রাখবো। যেসব মুসলিম আগমন করবেন আমরা তিন দিন পর্যন্ত তাদের মেহমানদারী করবো। আমরা ঐসব ঘরে বা বাসভূমি প্রভৃতিতে কোন গুপ্তচর লুকিয়ে রাখবো না। মুসলিমদের সাথে কোন প্রতারণা করবো না। নিজেদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দেবো না। নিজেরা শিরক প্রকাশ করবো না এবং অন্যদের শিরকের দিকে আহ্বান করবো না। আমাদের কেউ যদি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করে তাহলে আমরা তাদের কোন রকম বাধা দিবো না। মুসলিমদের আমরা সম্মান করবো। যদি তারা আমাদের কাছে বসার ইচ্ছা করেন তবে আমরা তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দেবো। কোন কিছুতেই আমরা নিজেদের মুসলিমদের সমান মনে করবো না, পোশাক পরিচ্ছেদেও না। আমরা তাদের কথার উপর কথা বলবো না। জিন্ বিশিষ্ট ঘোড়ার উপর আমরা সওয়ার হবো না। আমরা তরবারি ঝোলাবো না এবং সাথে তরবারিও রাখবো না। অঙ্গুরির উপর আরবি নকশা অংকন করাবো না এবং মাথার অগ্রভাগের চুল কেটে ফেলবো না। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, পৈতা অবশ্য অবশ্যই ফেলে রাখবো। আমাদের গির্জাসমূহের উপর ক্রুশ প্রদর্শন করবো না, আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো মুসলিমদের যাতায়াতের স্থানে এবং বাজার সমূহে প্রকাশিত হতে দেবো না। গির্জায় উচ্চৈঃস্বরে ঘণ্টা বাজাবো না, মুসলিমদের উপস্থিতিতে আমাদের ধর্মীয় পুস্তকসমূহ জোরে জোরে পাঠ করবো না, রাস্তাঘাটে নিজেদের চান চলন ও রীতি নীতি প্রকাশ করবো না, নিজেদের মৃতদের উপর বিলাপ করবো না এবং মুসলিমদের চলার পথে মৃতদেহের সাথে আগুন নিয়ে যাবো না। যেসব গোলাম মুসলিমদের অংশে পড়বে তা আমরা গ্রহণ করবো না। আমরা অবশ্যই মুসলিমদের শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকবো। মুসলিমদের ঘরে আমরা উঁকি মারবো না।” [তাফসীর ইবনে কাসির]

অতঃপর তাদের এই অবমাননাকর শর্তগুলোর পর আমিরুল মু’মিনীন উমার ﷺ আরও একটি শর্ত লাগিয়ে দেন যে, তারা কোন মুসলিমকে প্রহার করবে না। অতঃপর

তাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। উপরের দলীল সমূহ অনুসারে এটাই প্রমাণ হয় যে, ইব্রাহীম ﷺ থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এবং তার সাহাবীগণ ﷺ কেউই অসাম্প্রদায়িকতা এবং আন্ত-ধর্মীয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাহলে আমাদের প্রশ্ন হলো আল্লাহর দুশমন কাফির-মুশরিকদের ভালোবাসার দিকে আহ্বানকারী এই দ্বীন আসলে কাদের দ্বীন? আল্লাহর দুশমনদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন এবং তাদের ঘৃণা করা হলো আল্লাহর দ্বীন, তদুপরি একে যদি কেউ "সংকীর্ণতা" বলে অবিহিত করে তাহলে সে মুরতাদ কাফির।

আলোচ্য কিতাবটিতে এরপর তারা বলে: *"ইসলাম প্রেম ও ভালোবাসার ধর্ম। হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানির কোন স্থান ইসলামে নেই।"* [পৃষ্ঠা ১] তারপর তারা একটি হাদিস নিয়ে আসে: *"আল-বারা ইবনে 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি (সা.) জিজ্ঞাস করলেন, তোমরা বলো তো ইসলামের কোন বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ? তারা (অর্থাৎ তাদের কেউ) বললেন, নামায। তিনি (সা.) বললেন, আচ্ছা; তবে তা নয়। তাদের অন্য কেউ বললেন, যাকাত। তিনি (সা.) বললেন, রোযা। তিনি (সা.) বললেন, আচ্ছা; তবে তা নয়। তাদের অন্য কেউ বললেন, জিহাদ। তিনি (সা.) বললেন, আচ্ছা; তবে তা নয়। শেষে তিনি (সা.) বললেন, ঈমান-ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, "আল্লাহর জন্য [মানুষ ও সৃষ্টি জীবকে] ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য কাউকে অপছন্দ করা।"* [পৃষ্ঠা ১-২] বস্তুত এখানে হাদিসটির শেষাংশের অনুবাদ ইচ্ছাকৃতভাবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিকৃত করেছে।

"قَالَ: إِنَّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللهِ، وَتُبْغِضَ فِي اللهِ"

এর সঠিক অনুবাদ হচ্ছে "তিনি ﷺ বলেন: নিশ্চয়ই ঈমানের সবচেয়ে শক্ত বাধন হচ্ছে: তুমি আল্লাহ জন্য কাউকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করবে।" এখানে بغض শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে যার প্রকৃত অর্থ হলো ঘৃণা বা বিদ্বেষ। এই হাদিস {মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফিরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।} [আল-ফাতহ: ২৯] এই আয়াতেরই ব্যাখ্যা। এবং এটাই হচ্ছে "আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা" এর আক্বিদাহ যা দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ পোষণ করেন।

দাওলাতুল ইসলামের সাবেক মুখপাত্র শাইখুল মুজাহিদ আবু মুহাম্মাদ আল-

আদনানী (আল্লাহ তাকে কবুল করুন এবং জান্নাতে উঁচু স্থান দান করুন) তার বিখ্যাত বক্তব্য السلمية دين من। (শান্তিবাদ কার দ্বীন?) –এর “সংঘর্ষ অনিবার্য এবং শান্তিপূর্ণ আহ্বান ডাস্টবিনে” শীর্ষক অংশে বলেন:

“এখন আমাদের বুঝা, মেনে নেয়ার এবং স্বীকার করার সময় এসেছে যে শান্তিবাদ সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না; সময় এসেছে এর দিকে আহ্বানকারীদের তাদের এই মিথ্যা দাবি ত্যাগ করার, ঈমানদারদের সাথে কুফফাররা কখনই শান্তিতে থাকতে পারে না, আর আগ্রাসী অপরাধী কুফরের সামনে নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ ঈমান টিকে থাকতে পারে না, আর এই যে (আল্লাহর) কিতাব যা আমাদের মধ্যে ফয়সালা করবে:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {তারা বলল, হে নূহ যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি নিশ্চিতই প্রস্তরাঘাতে নিহত হবে।} [আশ-শূরা: ১১৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {সে (ইব্রাহীমের পিতা) বললঃ যে ইব্রাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমাকে হত্যা করবো। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও।} [মারিয়াম: ৪৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {তারা বলল, আমরা তোমাদেরকে অশুভ-অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।} [ইয়াসিন: ১৮]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {(ফেরাউন) বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।} [আশ-শূরা: ২৯]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {(ফেরাউন মুসাকে বলল) অবশ্যই আমি বিপরীত দিকে থেকে তোমাদের হাত-পা কেটে দেব। তারপর তোমাদের সবাইকে শূলীতে চড়িয়ে মারব।} [আল-আরাফ: ১২৪]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {কাফিররা রাসূলদের বলেছিল: আমরা তোমাদেরকে দেশ

থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিমদেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব।} [ইব্রাহীম: ১৩]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {উত্তরে তার কওম শুধু এ কথাটিই বললো, লুত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। এরা তো এমন লোক যারা শুধু পাক-পবিত্র সাজতে চায়।} [আন-নামল: ৫৬]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {তারা বলল: হে শোয়াইব, তুমি যা বলেছ তার অনেক কথাই আমাদের বুঝে আসে নি, আমারা তো তোমাকে আমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি রূপে মনে করি। তোমার ভাই বন্ধুরা না থাকলে আমরা তোমাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতাম। আমাদের দৃষ্টিতে তুমি কোন মর্যাদাবান ব্যক্তি নও।} [হুদ: ৯১]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {আর কাফিররা যখন ষড়যন্ত্র করত তোমাকে বন্দী অথবা হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে বের করে দেয়ার জন্য} [আল-আনফাল: ৩০]

এই মর্মে আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যুগ যুগ ধরে রাসূল এবং তাদের অনুসারীগণের সাথে কুফফার আর তাওয়াগীতের সম্পর্ক এমনই ছিলো, এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা পরিবর্তিত হবার নয়। কারণ নিঃসন্দেহে কুফফাররা যুক্তি বদলে যুক্তি আর দলীলের বদলে দলীল নিয়ে আসতে পাবে না, তাই তারা পেশি শক্তির আশ্রয় নিবে, আর মুসলিমদের ব্যাপারে কুফফারদের অবস্থান কখনই পরিবর্তিত হবার নয়:

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {বস্তুত: তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে সম্ভব হলে তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে বের করে নিয়ে যায়।} [আল-বাক্বারাহ: ২১৭]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {কিরূপে? তারা তোমাদের উপর জয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তার ও অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা দেবে না।} [আত-তাওবাহ: ৮]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {তারা যদি তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।} [আল-কাহফ: ২০]

আল্লাহ তায়ালা বলেন: {তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও জিহবা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরা ও কাফির হয়ে যাও।} [আল-মুমতাহিনাহ: ২]

এই হলো দৃশ্য অদৃশ্য সবকিছুর ব্যাপারে জ্ঞানী আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ যে, সর্বকালের জন্য ঈমানদার এবং দ্বীনের দিকে আহ্বানকারীদের সাথে কুফফারদের সম্পর্ক এমনই হবে। অতঃপর, এমন ব্যক্তি যে আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং তাঁর আদেশ অনুসারে কাজ করে, এমনকি এমন সব ব্যক্তিও যাদের সুস্থ মগজ-মস্তিষ্ক আছে তারা সবাই নিশ্চিত যে, সশস্ত্র কুফর অবশ্যই মানুষ এবং নিরস্ত্র দাওয়াতের অনুসরণ করার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। অবশ্যই (হিদায়াত বহনকারী) কিতাবের সাথে শক্তি আর সামর্থ্য থাকা আবশ্যক যা হককে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে এবং এর অনুসরণকারীদের রক্ষা করবে, এমনকি শিকল পড়িয়ে টেনে হিঁচড়ে মানুষকে জান্নাতের নিয়ে যাবে, কারণ বয়ান জ্ঞানীদের ক্ষেত্রে কাজ করে, আর জাহেলদের জন্য তরবারি আর বর্শাই হলো তাদের রোগ (নিরাময়ের পন্থা)।

(কবিতা)

এই হলো সেই ওহী আর ধারালো তরবারি, যার ঝলকানি সকল ঔদ্ধত্যকে দূর করে।
প্রথমটি হচ্ছে জ্ঞানীদের ঔষধ, আর পরেরটা জাহেলদের জন্য।

যদি নিরস্ত্র ঈমান এবং শান্তিবাদী দাওয়াত সশস্ত্র কুফরের মোকাবেলা করতে পারতো তাহলে নবী ﷺ কখনই যুদ্ধ করতেন না আর তার সেই উম্মাহকে কষ্ট দিতেন না যার প্রতি তিনি ছিলেন পরম দয়াপরবশ। যদি শান্তিবাদ সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে আর কোন অনাচারকে প্রতিস্থাপন পারতো তাহলে নবী ﷺ কখনই এক বিন্দুও রক্ত ঝরাতেন না, কারণ তিনি ছিলেন মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী, বিশ্বস্ত, ধৈর্যশীল এবং দয়াপরবশ, আর আল্লাহ তায়ালা তাকে সৃষ্টিকুলের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

(কবিতা)

কিছু সময়ের জন্য মুস্তফা মক্কায় দাওয়াত দেন, তার বিনম্র ভাষা সত্ত্বেও তারা একে মেনে নেয় নি
কিন্তু যখন তিনি দাওয়াত দিলেন আর তার হাতে ছিলো তরবারি, তারা আত্মসমর্পণ আর তাওবাহ করতো ইসলামে প্রবেশ করলো।

অতঃপর, যদি কেউ দাবি করে যে শান্তিবাদী আহ্বান দ্বারা অনাচারকে প্রতিস্থাপন, হক আদায় আর জুলুমকে দূর করা যায়, তার মানে হলো তার দাবি অনুসারে সে নবী ﷺ এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী আর দয়াপরবশ, আর তার পন্থা নবী ﷺ এর পন্থার চেয়ে উত্তম! হায়, নবী ﷺ তা থেকে কতো উত্তম। আর যদি কেউ দাবি করে যে, শান্তিবাদী আহ্বান দ্বারা আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাহলে সে আল্লাহর কিতাব আর নবী ﷺ এর সুন্নাহকে ফেলে দিয়ে নিজের ধ্যান-ধারণাকে অনুসরণ করলো।”

[এখানেই তার বক্তব্যের সমাপ্তি]

হ্যাঁ! দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ এই মহাসত্যকে উপলব্ধি করেছেন যে, ইসলাম এক দিনের জন্যও সকল মানুষের জন্য প্রেম-প্রীতি আর ভালোবাসার ধর্ম ছিলো না, এই দ্বীন সত্যকে সত্য ঘোষণা করে আর মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। বাতিলের প্রতি মুচকি হাসি দেয়া আর জুলুমকে বুকে টেনে নেয়া এই দ্বীনের অনুসারীদের কাজ নয়। কুফরের চেয়ে বড় বাতিল আর কি হতে পারে? আর শিরকের চেয়ে বড় জুলুম কি আর কিছু আছে?

জিহাদ

এই কিতাবের সর্বশেষ আলোচ্য বিষয় হিসেবে আমরা জিহাদকে নির্ধারণ করেছি, কারণ তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত ইসলামের বিরুদ্ধে চলা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের নিশানা জিহাদের উপরই। আর তা হওয়াটাই স্বাভাবিক, কেননা জিহাদ হলো ইসলামের "সর্বোচ্চ চূড়া"। ইমাম নববী ﵀ তার বিখ্যাত চল্লিশটি হাদিসের সংকলনে মুয়াজ বিন জাবাল ﵁ হতে বর্ণিত একটি বিখ্যাত এবং দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "আমি কি তোমাকে (হে মুয়াজ) বিষয়াদির মাথা, এর ভিত্তি আর এর সর্বোচ্চ চূড়ার কথা বলবো?" মুয়াজ ﵁ বলেন: "অবশ্যই, ইয়া রাসূলুল্লাহ।" তিনি ﷺ বলেন: "এর মাথা হচ্ছে ইসলাম, এর ভিত্তি হচ্ছে সালাত এবং এর সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ।" নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল সত্যবাদী নবী ﷺ সত্য বলেছেন।

জিহাদ হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদবাদী বান্দাদের সেই ইবাদত যা ইসলামকে তার মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়, মুসলিমদের কুফরের থাবা থেকে রক্ষা করে। তাই, সেই জিহাদ নিয়েই বর্তমান জামানার কাফির তাগূত মুরতাদদের যত মাথা ব্যথা। তারা তাদের জান-মাল, সহায়-সম্পত্তি এবং সন্তানদের অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছে জিহাদ আর মুজাহিদদের প্রতিরোধ করার জন্য। কামান-গোলা আর বিমান দ্বারা ইসলাম আর জিহাদের যে ক্ষতি তারা করেছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ক্ষতি তারা করতে সক্ষম হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের ময়দানে, আর সেখানে তাদের অস্ত্র হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব "দরবারী আলেমরা"। জিহাদের নাম শুনার সাথে সাথে তারা এর কয়েক শত অর্থ আবিষ্কার করে। হাতের জিহাদ, পায়ের জিহাদ, গলার জিহাদ আর কলমের জিহাদ আরও কতকি। হয়তোবা তাদের এই বিভ্রান্তি আর সংশয়ের মধ্যে আটকা পড়ে উম্মতের কিছু সংখ্যক যুবক পথ হারাবে আর তথাকথিত শান্তিবাদী-গান্ধীবাদী ইসলামের ঝাণ্ডার নিচের বলির পাঠার মত নিজের মাথা পেতে দেবে। কিন্তু, হায়! তাদের এই আশা কখনই পূর্ণ হবে না। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ বিপথে পরিচালিত করতে পারে না, আর যাকে বিপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ সুপথ প্রদর্শন করতে পারে না। তদুপরি, আল্লাহ ﷻ বলেন: {এর দ্বারা আল্লাহ অনেকেই বিপথে পরিচালিত করেন এবং অনেকেই হিদায়াত দান করেন, আর বস্তুত ফাসিকদের ছাড়া কাওকে তিনি এর দ্বারা বিপথে পরিচালিত করেন না।} [আল-বাক্বারাহ: ২৬] অর্থাৎ, হকের অন্বেষণকারীদের আল্লাহ অবশ্যই হিদায়াত দান করবেন আর যারা বিপথে পরিচালিত হবে তারা বিপথে পরিচালিত হবে তাদের পাপের কারণে। আল্লাহ আমাদের হৃদয়কে হিদায়তের পথে দৃঢ় রাখুন।

আলোচ্য কিতাবটিতে তারা বলে: *“ইসলামের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া বা প্রয়োগ করা বা যুদ্ধ করাকেই জিহাদ বিল ইয়াদ বা কিতাল নামে আখ্যায়িত করা হয়। তবে কুরআনের ৩৬ টি আয়াতে জিহাদের উল্লেখ থাকলেও যুদ্ধের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে মাত্র কয়েকটি আয়াতে।”* [পৃষ্ঠা ৬৪] তারা এখানে দাবি করেছে যে কুরআনে যুদ্ধ বা قتال এর আয়াত খুব একটা নেই, কিন্তু হাস্যকর বিষয় হলো তারা নিজেই তাদের কিতাবে শুধুমাত্র কিতাল বা যুদ্ধ সংক্রান্ত ৩০ টি আয়াত উল্লেখ করেছে, যদিও কোরআনে তার সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশি। এখানে উল্লেখ্য যে, কোরআনের একটি আয়াতও যদি কোন হুকুম জারি করে তার উপর আমল করা ফরজ।

তারা বলে: *“জিহাদের একটা স্তর হলো কিতাল বা বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ। এটি অনন্য উপায়মূলক একটি ব্যবস্থা। ফিকহের পরিভাষায় এটিকে বলা যায় ‘حسن لغيره’” অর্থাৎ এমন কাজ যা মূলত উত্তম নয়, কাম্য নয়, তবে উপায়হীন অবস্থায় করতে হয়, সেটি হলো এমন কাজ।”* [পৃষ্ঠা ২৮] এখানে তারা হানাফি মাযহাবের একটি কিতাবের বক্তব্যকে বিকৃত করেছে। হানাফি মাযহাবের কিতাব "التقرير والتحبير" -এ ফিকহী কিছু মাসায়েলের বর্ণনা করার জন্য লেখক ﷺ জিহাদকে হাসান লি-গাইরিহি বলে সম্বোধন করেন। সেখানে তিনি হাসান লি-গাইরিহি এর বর্ণনা দেয়ার জন্য তিনটি উদাহরণ এর ব্যবহার করেন। তা হলো জিহাদ, হদ আর সালাতুল জানাজা। অতঃপর তাগূতের এই চেলাদের বক্তব্য অনুসারে যদি জিহাদ *“উত্তম নয়, কাম্য নয়, তবে উপায়হীন অবস্থায় করতে হয়”* এমন কাজ হয় তাহলে মৃত মুসলিমের প্রতি জানাজার সালাত আদায় করারও *“উত্তম নয়, কাম্য নয়, তবে উপায়হীন অবস্থায় করতে হয়”* বলে গণ্য হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, তাগূতের চেলা-চামচা উলামা নামধারী শয়তানরা যদি আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে স্বাভাবিক ভাবে মারা যায় অথবা মুজাহিদদের হাতে নিহত হয় তাহলে তাদের জানাজা আদায় করা হারাম এবং জেনে শুনে তাদের জানাজায় অংশ গ্রহণ করাও কুফর আকবর, যা মানুষকে দ্বীন থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তাদেরকে হালাক করুন এবং দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের সহজ শিকারে পরিণত করুন।

আসলে التقرير والتحبير। কিতাবে বলা হয়েছে জিহাদ, হদ এবং সালাতুল জানাজা বিষয়গুলো শর্তযুক্ত। যেমন জিহাদের উদ্দেশ্য হলো কুফরকে প্রতিহত করা, তাই যদি কুফর না থাকে তাহলে জিহাদও থাকবে না। যদি হদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উপযুক্ত অপরাধ সংঘটিত না হয় তাহলে হদ থাকবে আর কোন মুসলিমের মৃত্যু না হলে সালাতুল জানাজা আদায় করা হবে না। অর্থাৎ এই উত্তম কাজগুলো তখনই সম্পাদন করা হবে যখন তার জন্য শর্ত পূর্ণ হবে। এখানে একেই حسن لغيره (হাসান লি-

গ্বাইরিহি) বলে অবিহিত করা হয়েছে। আল্লাহর দুশমন মিথ্যাবাদীরা সেই বক্তব্যকেই বিকৃত করে দাবি করেছে জিহাদ কোন উত্তম কাজ নয় আর কাম্যও নয়। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। আল্লাহ ﷻ বলেন: {নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর।} [আস-সাফ: ৪] আল্লাহ ﷻ আরও বলেন: {যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম।} [আত-তাওবাহ: ২০]

আবু হুরায়রা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাস করা হল: "কোন আমলটি সর্বোত্তম?" তিনি বললেন: "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা।" তারপর কোনটি জিজ্ঞাসা করা হলো। নবী ﷺ বললেন: "জিহাদ সকল আমলের চূড়া।" তারপর কোনটি জিজ্ঞাসা করা হলো। তিনি ﷺ বললেন: "কবুল হজ্জ।" [আত-তিরমিজি, মুসনাদ আহমাদ]

আবু হুরায়ারা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "আমি ইচ্ছা করি যে আমি আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবো এবং নিহত হবো, তারপর আবার জীবিত হবো এবং আবার নিহত হবো, তারপর আবার জীবিত হবো এবং আবার নিহত হবো, তারপর আবার জীবিত হবো এবং আবার নিহত হবো, তারপর আবার জীবিত হবো।" [বুখারী]

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদিস সমূহ জিহাদ এবং কিতালের ফযিলত বর্ণনাকারী অসংখ্য দলীলের ক্ষুদ্র একটি অংশ। আল্লাহ ﷻ তাঁর রাহে যুদ্ধকারীদের ভালোবাসেন এবং তাদের উঁচু দরজা দান করেন, এই হচ্ছে সেই জিহাদ যা সকল আমলের চূড়া আর আল্লাহর রাহে কিতাল করার সেই আমল যার জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ বার বার জীবিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে। আর আল্লাহর দুশমনরা দাবী করে জিহাদ *"উত্তম নয়, কাম্য নয়, তবে উপায়হীন অবস্থায় করতে হয়"*!

জিহাদের ব্যাপারে তাদের বিভিন্ন মিথ্যাচারের জবাব দেয়ার পূর্বে আমরা কোরআনের বিখ্যাত দুটি আয়াতের ব্যাপারে সামান্য আলোচনাকে জরুরি মনে করি। আর তা হলো সুরা আত-তাওবাহ এর ৫ম আয়াত, যে আয়াতটি উম্মতের অগ্রগামী মুফাসসিরগণের কাছে آية السيف বা "তরবারির আয়াত" নামে পরিচিত, আর অপর আয়াতটি হচ্ছে সুরা আত-তাওবাহ এর ২৯ তম আয়াত, যা মুফাসসিরগণের কাছে آية القتال বা "যুদ্ধের আয়াত" নামে পরিচিত। আমরা এই আয়াত দুটির ব্যাখ্যা

করাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি কারণ জিহাদের হুকুম আহকাম কোরআনে নাজিল হয়েছে ক্রমান্বয়ে। রাসূল ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে প্রাথমিকভাবে তার প্রতি শুধুমাত্র দাওয়াত এবং ধৈর্য ধারণ করার আয়াত নাজিল হয়। তারপর মদিনায় হিজরত করার পর যুদ্ধ করা অনুমতি প্রদান করা হয় এবং সর্বশেষ জিহাদকে সাধারণভাবে ফরজ করা হয়। এই দুটি আয়াতের দ্বারাই আল্লাহ ﷻ সশস্ত্র জিহাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত হুকুম জারি করেছেন। তাই এই আয়াত দুটিকেই দরবারী আলেমরা সবচেয়ে বেশি বিকৃত করার চেষ্টা করে।

আল্লাহ ﷻ বলেন: "অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও সেখানেই, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁত পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [আত-তাওবাহ: ৫]

এই আয়াতের ব্যাপারে তাগূতের চামচারা বিশেষ করে যে সংশয়টি সৃষ্টি করে তা হলো, "এই আয়াত শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য। যুদ্ধ ক্ষেত্রের বাহিরে অন্য কোথাও এই আয়াতের প্রয়োগ করা হবে না।" এই আয়াতের জাহের বা বাহ্যিক অর্থ যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের কাছে পরিষ্কার – মুসলিম কাফির নির্বিশেষে। এখানে আল্লাহর আদেশ হলো "তাদের যেখানে পাও হত্যা কর।" এই আয়াতের তাফসিরে তাবারী رحمه الله বলেন: "এর অর্থ, তাদের (মুশরিকদের) হত্যা কর পৃথিবীর সেখানে পাও সেখানেই, হারাম শরীফে হোক বা এর বাহিরে হোক, হারাম মাসে হোক বা হোক অন্য কোন মাসে।" [তাফসীর আত-তাবারী]

বাগ্বাওয়ী رحمه الله বলেন: "এর অর্থ, (মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে পাও সেখানে) হারাম শরীফে হোক আর এর বাহিরে হোক, তাদের বন্দী কর এবং আটক কর। ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, তারা যদি দুর্গে আশ্রয় নিতে চায় তাহলে তাদের অবরোধ কর এবং তাদের বের হতে দিও না। আরও বলা হয়েছে, তাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং মুসলিমদের ভূমিতে অসদাচরণ করতে দিও না...।

আল হাসান ইবনুল ফাদেল বলেন, এই আয়াত দুশমনদের আঘাতের বেলায় ধৈর্যধারণ এবং এড়িয়ে যাওয়ার মর্মে যত আয়াত আছে সেই সকল আয়াতকে রহিত করে।" [তাফসীর আল-বাগ্বাওয়ী]

ইবনে কাসির বলেন: “(মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে পাও সেখানে) অর্থাৎ তাদের পৃথিবীর যেকোন জায়গায়, এটি সাধারণ ঘোষণা, তবে এটি প্রসিদ্ধ যে (আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে) আয়াতটি দ্বারা হারাম শরীফের ভিতর যুদ্ধ করার ব্যাপারে বিশেষ ব্যতিক্রম রয়েছে।” [তাফসির ইবনে কাসির] এই মর্মে উলামা মুফাসসিরগণের আরও অনেক প্রসিদ্ধ বক্তব্য রয়েছে। উম্মতের অগ্রগামী মুফাসসিরদের কেউই এই আয়াতকে যুদ্ধের সাথে সংযুক্ত করেন নি, এটি বর্তমান যুগের জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী আলেমদের মনগড়া আবিষ্কার যার ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ বা তাঁর রাসূল ﷺ থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং রাসূল ﷺ ইসলাম গ্রহণ করা না পর্যন্ত সকল মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাঃ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “আমি এই মর্মে আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবো যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল এবং তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে।” [বুখারী ও মুসলিম]

আনাস রাঃ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: “আমাকে মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার করার আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, আর তারা আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের যবেহকৃত প্রাণী ভক্ষণ করে এবং আমাদের মত সালাত আদায় করে। যখন তারা এরূপ করবে তখন আমাদের কাছে তাদের জান-মাল হারাম হয়ে যাবে, তবে ইসলামের হক ব্যতীত। তারা তখন ঐ সব হকের অধিকারী হবে যা অন্যান্য মুসলিমরাও যার অধিকারী এবং অন্যান্য মুসলিমদের যে কর্তব্য আছে তা তাদেরও কর্তব্য হয়ে যাবে।” [বুখারী, মুসনাদ আহমাদ, ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য]

উপরের দলীলগুলো মুশরিকদের বিরুদ্ধে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তাদের জন্য মাত্র দুটি রাস্তা খুলা আছে, হয় তারা ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করবে। তদুপরি, এই সিদ্ধান্তের সাথে আহলে কিতাবদের জন্য বিশেষ বিধান নির্ধারণ করে আল্লাহ ﷻ বলেন: {তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং সত্য দ্বীনের অনুগত হয় না, যতক্ষণ না নতজানু হয়ে করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে।} [আত-তাওবাহ: ২৯] অর্থাৎ আহলে কিতাবদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা হয় দ্বীন ইসলামের অনুগত হয় অথবা

নতজানু হয়ে ইসলামের শাসনের বশ্যতা মেনে জিযিয়া প্রদান করে। এখানে উল্লেখ্য যে দারুল ইসলামে জান-মালের নিরাপত্তা সহকারে বসবাস করার জন্য আহলে কিতাবের কাফিররা মুসলিমদের খলিফা'র প্রতি যে কর প্রদান করে তাই কোরআনের পরিভাষায় জিযিয়া নামে পরিচিত। আর এই জিযিয়া প্রদান করে খলিফা'র সাথে জিযিয়া চুক্তি সম্পাদন করে যে সকল কাফির দারুল ইসলামে বসবাস করে তাদের শরীয়তের পরিভাষা বলা হয় أهل الذمة বা আহলুয যিম্মাহ।

উপরের আলোচনা সারমর্ম হচ্ছে, ইসলামের বিধান অনুসারে ফিকহের পরিভাষায় মানুষ তিনভাগে বিভক্ত:

১. مسلم (মুসলিম)
২. مسالم (মুসালিম; শান্তিপূর্ণভাবে বশ্যতা স্বীকারকারী কাফির)
৩. محارب (মুহারিব; সামরিক-বেসামরিক নির্বিশেষে চুক্তি বিহীন বাকি সকল কাফির)

কোরআন এবং সুন্নাহর বিধান অনুসারে মুসলিমদের জান-মাল অন্য মুসলিমের জন্য হারাম। এ ব্যাপারে দাওলাতুল ইসলামের বক্তব্য হচ্ছে: "মুসলিমদের রক্ত, সম্মান এবং সম্পদ আমাদের কাছে হারাম, তা থেকে একমাত্র তাই আমাদের জন্য হালাল হবে যা আল্লাহ আমাদের জন্য হালাল করেছেন এবং যাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ পতিত বলে ঘোষণা করেছেন।" [এই আমাদের আক্বিদাহ, এবং এই আমাদের মানহায]

এখানে আমরা দাওলাতুল ইসলামের "রুমিয়্যাহ" ম্যাগাজিনের ইংরেজি সংস্করণের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "কাফিরদের রক্ত হালাল, তাই তা প্রবাহিত করুন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো:

"ইসলাম হলো পুর্ণগর্ভ কিছু নীতির দ্বীন যা প্রদান করে নিখুঁত ভিত্তি যার উপর ন্যায় ও গৌরবের মজবুত কাঠামো প্রতিষ্ঠিত। এই মহৎ নীতিগুলোর একটি হলো, সকল মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা ইসলাম কবুল করে অথবা শরীয়াহর চুক্তির অধীনে চলে আসে। এই নীতির ফলে কোন মুসলিম এবং চুক্তিবদ্ধ কোন কাফিরের রক্ত প্রবাহিত করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয় এবং সেই সাথে অন্যান্য কুফফারদের রক্ত প্রবাহিত করার অনুমতি পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমাকে মানুষদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে যতক্ষণ না তারা বলে যে,

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, আর তারা সালাহ কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। যে এরকম করবে তার রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ কিন্তু ইসলামের আইন ছাড়া," [ইবনে উমার কর্তৃক আল বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত] আর তিনি ﷺ মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "নিশ্চয়ই তোমাদের নিজেদের রক্ত, সম্পদ এবং সম্ভ্রম একে অপরের কাছে হারাম।" [আবু বাক্কারাহ থেকে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত] আর যিম্মিদের ব্যাপারে – যার সাথে মুসলিমদের চুক্তি রয়েছে – রাসূল ﷺ বলেছেন, "যেকেউ চুক্তিবদ্ধ কোন একজন লোককে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না, অথচ তার সুবাস চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায় ।" [আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত] উক্ত রিওয়াতগুলো এই আয়াতের ব্যাখ্যা দেয়, "আর আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন; যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করো না।" [আল আনআম: ১৫১] এই সম্পর্কে আত-তাবারি বলেছেন, "আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন সে হলো একজন মুমিন অথবা চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যক্তি, আর আল্লাহ বলেছেন "যথার্থ কারণ ছাড়া" এর মানে হলো, যার ফলে কাউকে হত্যা করার অনুমোদন পাওয়া যায়, যেমন হত্যার কারণে মৃত্যুদণ্ড অথবা ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করা কিংবা রিদ্দার কারণে কাউকে হত্যা করা।"

অন্যান্যদের ক্ষেত্রে – অর্থাৎ সকল কুফফার যাদের সাথে কোন চুক্তি নেই – তাদের রক্ত নিষেধাজ্ঞার পবিত্রতা বহন করে না, উপরন্তু এই বিষয়টি মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশের অধীনেই থেকে যায়, তাই তাদের রক্ত হালাল। জিম্মি নয় এমন কোন কাফিরের রক্ত প্রবাহিত করা পাপ নয়, বরং এর প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত পাওয়া যাবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "একজন কাফির এবং তাদের হত্যাকারী কখনও জাহান্নামের আগুনে একত্রিত হবে না।" [আবু হুরাইরা থেকে মুসলিমে বর্ণিত] অধিকন্তু, "আমাকে মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে" তার ﷺ এই কথাতে তর্কের কোন বিষয় নেই, যেহেতু মানবজাতির মধ্যে পৃথিবীর সকল মানুষ বুঝায় এবং এই আদেশের বহির্ভূত শুধুমাত্র তারা যারা ইসলামের কাছে বশ্যতা কিংবা আত্মসমর্পণ করেছে, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তা একমাত্র সেই রাসূলের জন্যই মানানসই যাকে সকল মানুষের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, "তুমি ঘোষণা করে দাওঃ হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্যে আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি," [আল আরাফ: ১৫৮] এবং রাসূল ﷺ বলেছেন, "অন্যান্য রাসূলগণকে শুধুমাত্র তাদের জাতির লোকদের নিকটে প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু আমাকে সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।" [জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বুখারিতে বর্ণিত]

এর পরেও কেউ ভাবতে পারে যে এটি বিস্ময়কর – নতুন মতাদর্শ, তাহলে তার জানা উচিত যে, এটি ছিলো সাহাবা এবং এই উম্মাহর মহান আলেমদের অবস্থান। এই বিষয়টি উমার ইবনে আল-খাত্তাব এর কথাতে প্রতিফলিত হয় যিনি রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশাতে কোন প্রকার আপত্তি ছাড়াই আবু জানদালকে তার পিতা সুহাইল ইবনে আমরকে হত্যার জন্য উৎসাহিত করে বলেছিলেন, “হে আবু জানদাল ধৈর্য ধরো,কারণ তারা কেবলমাত্র মুশরিক আর তাদের রক্ত ও কুকুরের রক্তের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।” [আল মিসওয়ার ইবনে মাখরামাহ থেকে আহমাদে বর্ণিত] নিশ্চয়ই উমার সঠিক ছিলেন, কারণ মুশরিকরা সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র, যেমনটি আল্লাহ বলেছেন, “হে মুমিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে অপবিত্র।” [আত তাওবাহ: ২৮]

এটি আনাস ইবনে মালিকের কথাতেও বুঝা যায়, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, “হে আবু হামজাহ! কি কারণে একজন বান্দার রক্ত ও সম্পদ হারাম হয়ে যায়?” তিনি বলেছিলেন, যে কেউ এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মত সালাহ আদায় করে এবং আমরা যা জবাই করি তা থেকে ভক্ষণ করে, তাহলে সে একজন মুসলিম। একজন মুসলিম যা পাবে সেও তাই পাবে এবং একজন মুসলিমের যে দায়িত্ব তা তার উপরও বর্তাবে।” [মায়মুন ইবনে সিয়াহ থেকে বুখারিতে বর্ণিত]

আশ শাফি বলেছেন, “একজন কাফিরের রক্ত ঝরানোকে কখনোই অব্যাহতি দেয়া যাবে না যতক্ষণ না সে মুসলিম হয়।” [আল উম্ম] বিশদ ব্যাখ্যাতে তিনি বলেছেন, “আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধান অনুসারে আহলে কিতাবদের জন্য আল্লাহ রক্ত ঝরানোতে নিষ্কৃতি দিয়েছেন এবং সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছেন, কোন যথার্থ কারণ ছাড়া, এটি হতে পারে আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান আনয়ন কিংবা মুমিনদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া। আর তিনি এমন পূর্ণবয়স্ক মানুষদের রক্ত ঝরানোতে অনুমোদন দিয়েছেন যারা ঈমান আনয়ন হতে দূরে সরে থাকে কিংবা যাদের কোন চুক্তি নেই। আল্লাহ বলেছেন, {অতঃপর, যখন নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিবাহিত হয়ে যায় তখন ঐ মুশরিকদেরকে যেখানে পাও হত্যা করো, তাদেরকে গ্রেফতার করো, তাদেরকে অবরোধ করে রাখো এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের সন্ধানে অবস্থান করো} [আল উম্ম] নারী এবং শিশুদের হত্যা করা আপত্তির বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন, “কোন একজন মুসলিমের রক্ত প্রবাহিত করার নিষেধাজ্ঞা কাফির শিশু ও নারীদের রক্ত প্রবাহিত করার নিষেধাজ্ঞার থেকে আলাদা, নির্দিষ্ট আসমানি বিধানে নিষেধাজ্ঞা থাকার কারণে তাদের হত্যা করা হবে না [যদিও প্রাথমিক বিধান অনুসারে কাফিরদের

সর্বসাধারণের রক্ত প্রবাহিত করার অনুমতি রয়েছে]। আর এই সম্পর্কে আমাদের মতামত হলো – এবং আল্লাহই ভালো জানেন – এই নিষেধাজ্ঞার কারণ এই তারা দাসী হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে , যেটি তাদেরকে হত্যা করার চেয়ে বেশী পছন্দনীয়, আর তাদেরকে হত্যার ফলে শত্রুদের কোন ক্ষতি হয় না; আর তাই তাদেরকে হত্যা করার চেয়ে দাসে পরিণত করা অধিক উত্তম।" [আল উম্ম]

আল খাত্তাবি বলেছেন, "কাফিরদের রক্ত ঝরানোর অনুমোদন রয়েছে কারণ তারা কখনোই তাওহীদের কালেমার সাক্ষ্য দেয়নি; কিন্তু যদি তারা এই সাক্ষ্য দিত তাহলে তাকে নিষ্কৃতি দেয়া হত এবং তার রক্ত হারাম হতো।" [আ'লাম আল-হাদিস]

নারী ও শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে উল্লেখ করার পর ইবনে হাজম বলেন, "মুশরিকদের যে কাউকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে – যাদের বিষয়ে উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের ছাড়াই, সে যোদ্ধা হোক বা বে-সামরিক হোক, ব্যবসায়ী বা চাকুরীজীবী, বৃদ্ধ – সে প্রভাবশালী হোক বা না হোক – কৃষক, ধর্মযাজক কিংবা পুরোহিত, অন্ধ হোক কিংবা প্রতিবন্ধী হোক – কাউকেই ছাড় দেওয়া যাবে না।" [আল-মুহাল্লা]

ইবনে ক্বুদামাহ হারবি (যে কাফির চুক্তিবদ্ধ নয়) এর সম্পর্কে উল্লেখ করে বলেন, "কোন প্রকার আপত্তি ছাড়াই তার রক্ত প্রবাহিত করার অনুমতি রয়েছে, ঠিক শুকরের মতো।" [আল-মুগনি] তিনি আরো বলেন, "আসলি কুফফারদের (যারা মুরতাদ নয়) নিজেদের ভূমিতে তাদের কোন নিরাপত্তা নেই" [আল-মুগনি]

ইবনে রুশদ বলেন, "আর মূলনীতি হলো যে, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণে যা অনুমোদন দেয় তা হলো কুফর এবং যা সম্পদ রক্ষা করে তা হলো ইসলাম, যেমনটি রাসূল ﷺ বলেছেন, "এবং যদি তারা এই সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে সুরক্ষিত।" [বিদায়াত আল-মুজতাহিদ] যদিও বিশেষভাবে তিনি সম্পদের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু রক্ত প্রবাহের বিষয়টিও তার কথা থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় কারণ তিনি উপরোক্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

আল-ক্বুরতুবি বলেন, "যদি কোন একজন মুসলিম কোন চুক্তিবিহীন কাফিরের সাথে সাক্ষাত হয়, তাহলে সেই মুসলিমের জন্য তাকে হত্যা করার অনুমতি রয়েছে।"

একজন নিহত কাফিরের সম্পর্কে আবু হানিফা বলেন, "এক্ষেত্রে কোন প্রতিশোধ নেই হত্যাকারীর বিরুদ্ধে এবং কোন দিয়াহ (রক্তপণ) পরিশোধ করতে হবেনা, কারণ যদি এটা প্রমাণিত না হয় যে সে একজন চুক্তিবদ্ধ বা জিম্মার অধীনে তাহলে কাফিরের রক্ত (প্রবাহিত করার) অনুমতি রয়েছে ।" [আল-হাওয়ি আল-কাবির] একইভাবে প্রসিদ্ধ হানাফি আলেম আল-কাশানি বলেন, "মূলনীতি হলো এটা যে, যারা যুদ্ধে রয়েছে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে) তাদের মধ্যকার যে কাউকে হত্যা করার অনুমোদন রয়েছে, হোক তারা যুদ্ধ করুক বা না করুক। কিন্তু যারা যুদ্ধে লিপ্ত নয় তাদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করার অনুমতি নেই (অর্থাৎ বৈধ চুক্তি), কিন্তু যদি তারা যুদ্ধ করে বা কৌশলগত সাহায্যের আবেদন করে, উস্কানি দেয় কিংবা অন্যান্য কিছু তাহলে ভিন্ন কথা। তাই পুরোহিত এবং সন্ন্যাসী যারা মানুষদের সাথে মিশে থাকে তাদের হত্যা করা হবে, এবং যারা পাগল, বোবা ও বধির এবং যার একটি হাত বা একটি পা রয়েছে তাদেরও হত্যা করা হবে, যদিও তারা যুদ্ধ করছে না। এর কারণ হলো তার ঐ একই লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা যুদ্ধে রয়েছে (মুসলিমদের বিরুদ্ধে)।" [বাদাই আস-সানাই]

যারা দ্বীন সম্পর্কে পড়াশুনা করেছে উপরোক্ত বিষয়গুলো তাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করবে না, কারণ কাফিরদের রক্ত প্রবাহের জন্য হালাল এই সম্পর্কে ঐকমত রয়েছে। আত-তাবারি বলেন, "তারা (ইসলামের আলেমগণ) একমত যে, যদি একজন মুশরিক হারামের (মক্কাতে) সকল বৃক্ষের বাকল পরিধান করে ও তা দ্বারা নিজের কাঁধ ও বাহু আবৃত করে রাখে, তবুও এই বিষয়টি তাকে হত্যা করা থেকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না, কিন্তু যদি কোন মুসলিম তার যিম্মার কোন চুক্তি করে বা নিরাপত্তা দেয় তাহলে ভিন্ন কথা।

[রুমিয়্যাহ থেকে উদ্ধৃতির সমাপ্তি]

উপরের আলোচনার সারমর্ম হচ্ছে নিরপরাধ কাফির বলতে ইসলামের অভিধানে কিছু নেই, কারণ আল্লাহর দ্বীনের অনুগত না হওয়া এবং শিরক করাই তাদের সবচেয়ে বড় অপরাধ। বাংলার মুসলিমদের কাছে দ্বীনের এই অতি মৌলিক জ্ঞান খুবই আশ্চর্যজনক হলেও দাওলাতুল ইসলামের ভূমিতে বসবাসকারী নাবালেগ শিশুরাও এই বিষয়গুলো ভালো করে জানে। উপরোক্ত এই বিস্তারিত আলোচনার পর কারই বিষয়গুলো সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ আমাদের বুঝার এবং আমল করার তাওফিক দান করুন।

ফিতনার মানে কি সন্ত্রাস?

এই পর্যায়ে আমরা আলোচ্য কিতাবটিতে জিহাদ আর ইসলাম সম্পর্কে তাগূতের দালালদের সীমাহীন মিথ্যাচার আর হাস্যকর যুক্তি-প্রমাণের ব্যবচ্ছেদ করবো ইনশাআল্লাহ। কিতাবটিতে তারা "ফিতনা" শব্দটির অনুবাদ করেছে "সন্ত্রাস"। আরবি ভাষা সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান রাখা কোন ব্যক্তিও যানে যে ফিতনা শব্দের অর্থ সন্ত্রাস নয়, তদুপরি তারা তাদের দাবীকৃত তথাকথিত "সন্ত্রাসবাদকে" হারাম ঘোষণা করার জন্য কোরআনের দুটি আয়াতের ব্যবহার করেছে, আল্লাহ ﷻ বলেন: {ফিতনা হত্যার চেয়েও গুরুতর।} [আল-বাক্বারাহ: ১৯১] এবং {ফিতনা হত্যার চেয়েও বড়} [আল-বাক্বারাহ: ২১৭] এখানে আয়াত দুটোর আংশিক ব্যবহার করে এর ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আল-বাক্বারাহ'র ২১৭ নাম্বার আয়াত সম্পূর্ণ পড়লেই এই সঠিক অর্থ অতি সহজে বুঝা যাবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ ﷻ বলেন: {সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরি করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও বড় পাপ। বস্তুত: তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে। } [আল-বাক্বারাহ: ২১৭]

এই আয়াত থেকে পরিষ্কার যে আল্লাহ ﷻ ফিতনা বলতে বুঝিয়েছেন "আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরি করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা।" এই কর্ম সবগুলোই কাফির-মুনাফিকদের কাজ। এখানে কোথাও ফিতনা এর অর্থ সন্ত্রাস বা যুদ্ধ নয়। বস্তুত: "ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও বড় পাপ" এর অর্থ হলো "আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরি করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা" হত্যার চেয়ে জঘন্য। তাফসির ইবনে কাসিরে এই আয়াত নাজিল হওয়ার শানে নুযূল বর্ণিত হয়েছে। তা নিম্নরূপ: "রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। (বাহিনীটির আমির) বিদায়ের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিচ্ছেদের

দুঃখে ভীষণ কান্না-কাটি করেন। (তা দেখে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ফিরিয়ে নেন এবং তার স্থলে আবদুল্লাহ বিন জাহাশ رضي الله عنه কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাকে একটি চিঠি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: 'বাতনে নাখলা'য় পৌঁছার আগে এই চিঠি পড়বে না, সেখানে পৌঁছে চিঠি পড়ার পর তখন সঙ্গীদের কাউকে তোমার সাথে যাবার জন্য বাধ্য করবে না। তারপর আবদুল্লাহ رضي الله عنه এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই যাত্রা শুরু করেন। নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে তিনি নবী ﷺ নির্দেশনামা পাঠ করে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েন এবং বলেন: 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশনামা পড়েছি এবং তার নির্দেশ পালনে প্রস্তুত রয়েছি।' অতঃপর তিনি তার সঙ্গীদের চিঠিটি পড়ে শোনান। এর পর তাদের দুই সঙ্গী ফিরে যান, কিন্তু অন্যান্য সবাই তার সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। ঐ দিনটি জুমাদাল আখিরাহ মাসের শেষ দিন ছিল কি রজবের প্রথম দিন ছিলো এটা তাদের জানা ছিল না। তারা কাফিরদের সেনাবাহিনীর উপর আক্রমণ চালান এবং (জনৈক মুশরিক) ইবনুল হাযরামী মারা যায়। সেখান থেকে মুসলিমদের দলটি ফিরে আসে। তখন মুশরিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলে 'দেখ! তারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করেছে এবং হত্যাও করেছে।' এ ব্যাপারে আয়াতটি নাজিল হয়। [মুসনাদ ইবনে আবি হাতিম]" তারপর একই মর্মে আরও একটি বর্ণনা উল্লেখ করে ইমাম ইবনে কাসির আয়াতটির তাফসির করে বলেন: "আল্লাহ তায়ালা (এই) আয়াতে বলেন: 'এই মাসগুলোতে যুদ্ধ হারাম বটে। কিন্তু হে মুশরিকরা! তোমাদের মন্দ কার্যাবলী তো মন্দ হিসেবে এর চেয়েও বড়। তোমরা আমাকে অস্বীকার করছো। তোমরা আমার নবীকে ও সাহাবীদের আমার মসজিদ হতে প্রতিরোধ করছো। তোমরা তাদেরকে তথা হতে বহিষ্কৃত করেছো। সুতরাং তোমাদের এই অসৎ কার্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর যে, ওগুলো কত জঘন্য কাজ!'"

অর্থাৎ এটা পরিষ্কার যে, এই আয়াতে ফিতনা এর অর্থ শিরক-কুফর জাতীয় পাপ, কাফির-মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নয়, যাকে তারা সন্ত্রাস বলে অবিহিত করে। তাদের উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক। উল্লেখ্য যে সন্ত্রাসবাদ এর আরবি শব্দ হলো "الإرهاب" । কোরআনের একটি মাত্র আয়াতে শব্দটি এসেছে আর তা হলো: {আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যাতে আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমনদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার হয়।} [আল-আনফাল: ৬০] এখানে আল্লাহ "ত্রাস সঞ্চার" এর ক্ষেত্রে "ترهبون" শব্দের ব্যাবহার করেছেন। এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে মুজাহিদ আলেমগণ মত পোষণ করেন যে, কাফিরদের বিরুদ্ধে ত্রাস সৃষ্টি করার মর্মে প্রতিটি মুসলিমের জন্য "সন্ত্রাসী" হওয়া ফরজ।

তারা ইসলামকে শান্তিবাদী-গান্ধীবাদী প্রমাণ করার জন্য আল্লাহর কোরআনের অপর একটি আয়াত নিয়ে মিথ্যাচার করে। আল্লাহ ﷻ কোরআনুল কারিমে বলেন: {আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে নির্জন গির্জা, ইবাদত খানা, উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।} [আল-হাজ্জ: ৪০] এখানে তারা এই আয়াতে "صلوات" এর অনুবাদ করেছে *"অগ্নি উপাসকদের অগ্নিমন্দির।"* [পৃষ্ঠা ৬] "صلوات" শব্দের অর্থ ইবাদতখানা এর অর্থ কখনই অগ্নি মন্দির নয়, তদুপরি তারা তাদের এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত মিথ্যাচারের সত্যায়নের জন্য মাজদুদ্দীন আল-ফায়রোযাবাদী এর *"তানভীরুল মিকবাস মিন তাফরীর ইবনে 'আব্বাস" কিতাব থেকে একটি বর্ণনা নিয়ে বলে ইবনে আব্বাস বলেছেন "সালাওয়াত অর্থ অগ্নিপূজারিদের আগুনপূজার ঘর।"* [পৃষ্ঠা ৬] এখানে পাঠকদের জানা উচিৎ মাজদুদ্দীন আল-ফায়রোযাবাদী এর "তানভীরুল মিকবাস মিন তাফরীর ইবনে 'আব্বাস" কিতাবটি একটি দুর্বল বর্ণনার কিতাব। কারণ এই কিতাবের সংকলক সম্পূর্ণ কিতাবটি মাত্র একটি সূত্র থেকে গ্রহণ করেছেন আর সেটা হলো ছোট সুদ্দী'র সূত্র, যে কিনা হাদিস জাল করা ও হাদীসের ব্যাপারে মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। সে আবার বর্ণনা গ্রহণ করেছে কালবী থেকে, সেও মিথ্যা বলার অভিযোগে অভিযুক্ত। মোদ্দাকথা হচ্ছে, মাজদুদ্দীন আল-ফায়রোযাবাদী এর "তানভীরুল মিকবাস মিন তাফরীর ইবনে 'আব্বাস" কিতাবটি থেকে উদ্ধৃতি সরাসরি গ্রহণযোগ্য নয় আর এই কিতাব থেকে কেউ সরাসরি দাবি করতে পারবে না এটি ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه এর বক্তব্য। অপরদিকে, ইমাম আল-ক্বুরতুবী তার তাফসীরে বলেন, "ইবনে আব্বাস বলেন: সালাওয়াত হলো গির্জা।" তারপর তারা আবারও তাদের চিরাচরিত ভণ্ডামির পন্থ অবলম্বন করে ইমাম আল-ক্বুরতুবী رحمه الله এর তাফসীরকে কাঁট-ছাঁট এবং ভুল তরজমা করে নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে।

বস্তুত এই আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা ইমাম আল-ক্বুরতুবী رحمه الله এর তাফসীর থেকেই পাওয়া যায়, এই ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে বেশি অবগত। ইমাম আল-ক্বুরতুবী رحمه الله এর আয়াতের তাফসীর করে বলেন: "তাছাড়া এই জায়গাগুলো (ইবাদতখানাগুলো) এই ধর্মগুলোর পরিবর্তন-বিকৃতি হওয়ার এবং ইসলামের আগমন দ্বারা রহিত হওয়ার পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে সেই অনুসারে এর (এই আয়াতের) অর্থ: এই প্রতিহতকরণ (অর্থাৎ মুমিনদের দ্বারা কাফিরদের প্রতিহত করা) না থাকলে মূসার জামানায় ইহুদীদের ইবাদতখানা, ঈসার জামানায় খ্রিস্টানদের ইবাদতখানা এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর জামানায়

মসজিদ সমূহ ধ্বংস হয়ে যেত।”

তারপর, তারা তাফসীর আল-ক্বুরতুবী এর কিছু অংশ নিয়ে আসে:

تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْمَنْعَ مِنْ هَدْمِ كَنَائِسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبِيَعِهِمْ وَبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ... لِأَنَّهَا جَرَتْ مَجْرَى بُيُوتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمُ الَّتِي عَاهَدُوا عَلَيْهَا فِي الصِّيَانَةِ

তারপর তারা এর অনুবাদ করে *“এই আয়াত প্রমাণ করে বিজিতদের উপাসনালয়, তাদের গির্জা ও অগ্নিপূজার ঘর ধ্বংস করা নিষেধ। ...কারণ, এ উপাসনালয়গুলো তাদের গৃহ ও সম্পত্তির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে পরিগণিত হয়, যেগুলো রক্ষা করার জন্য মুসলিমরা তাদের সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ।”* [পৃষ্ঠা ৬] আসলে এই উদ্ধৃতিতে মিথ্যাবাদীরা ব্যাপক মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। প্রথমত তারা اهل الذمة বা আহলুয যিম্মাহ এর অনুবাদ করেছে “বিজিত”। যা একটি মিথ্যাচার, আহলুয যিম্মাহ এর শরীয়ত সম্মত সংজ্ঞার বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তারপর তারা বক্তব্যের মাঝখানে “...” ব্যবহার করে বক্তব্যের অর্থকে সম্পূর্ণ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছে। আমরা নিম্নে বক্তব্যটির সম্পূর্ণ অংশ এবং সঠিক অনুবাদ প্রদান করছি:

قال بن خُوَيْزِ مَنْدَادَ: تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْمَنْعَ مِنْ هَدْمِ كَنَائِسِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبِيَعِهِمْ وَبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ، وَلَا يُتْرَكُونَ أَنْ يُحْدِثُوا مَا لَمْ يَكُنْ، وَلَا يَزِيدُونَ فِي الْبُنْيَانِ لَا سَعَةً وَلَا ارْتِفَاعًا، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَلَا يُصَلُّوا فِيهَا، وَمَتَى أَحْدَثُوا زِيَادَةً وَجَبَ نَقْضُهَا. وَيُنْقَضُ مَا وُجِدَ فِي بِلَادِ الْحَرْبِ مِنَ البيع والكنائس. وإنما لم ينقضا فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ، لِأَنَّهَا جَرَتْ مَجْرَى بُيُوتِهِمْ وَأَمْوَالِهِمُ الَّتِي عَاهَدُوا عَلَيْهَا فِي الصِّيَانَةِ. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمَكَّنُوا مِنَ الزِّيَادَةِ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ إِظْهَارَ أَسْبَابِ الْكُفْرِ.

ইমাম ক্বুরতুবী বলেন: “ইবনে খুয়াইজ মিনদাদ বলেন, ‘এই আয়াত আহলুয যিম্মার গির্জা, ইবাদতখানা এবং আগুনখানা ইত্যাদি ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকার দিকে ইঙ্গিত করে, তদুপরি তাদের সেখানে (তাদের ইবাদতখানায়) এমন কোন অংশ বর্ধন করতে দেয়া যাবে না যা পূর্বে ছিল না, তারা ভবন কাঠামোর আকার বা উচ্চতা বৃদ্ধি করতে পারবে না, মুসলিমদের জন্য সমীচীন নয় যে তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে এবং সালাত আদায় করবে, যদি তারা সেখানে কোন অংশ বৃদ্ধি করে তাহলে ওয়াজিব হলো তা ভেঙ্গে ফেলা। বিলাদ আল-হারবে (অর্থাৎ দারুল ইসলামের বাহিরে যে কোন জায়গায়) যেখানে তাদের কোন ইবাদতখানা বা চার্চ পাওয়া যাবে তা ভেঙ্গে

ফেলতে হবে। বিলাদুল ইসলামে আহলুয যিম্মার ইবাদতখানাগুলো শুধুমাত্র এই কারণে ধ্বংস করা হয় নি যে এ উপাসনালয়গুলো তাদের গৃহ ও সম্পত্তির স্থলাভিষিক্ত হিসেবে পরিগণিত হয়, যেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে তারা চুক্তি করেছে। কিন্তু তারা কোনভাবেই সেখানে কোন বর্ধন করতে পারবে না, কারণ তা হলে কুফর করা উপকরণ প্রকাশ পাবে।'" [তাফসীর আল-কুরতুবী]

উপরের এই বক্তব্যকেই তারা "..." ব্যবহার করে কেটে-ছেঁটে শান্তিবাদী-গান্ধিবাদীতে পরিণত করেছে। আল্লাহ ﷻ বলেন: {যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে তারই জালিম।} [আলে-ইমরান: ৯৪]

তারা তাদের কিতাবে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করার জিহাদকে ছোট জিহাদ দাবি করে যে হাদিস বর্ণনা করেছে তা মুহাদ্দিসিন-মুহাক্কিকগণের সর্ব সম্মতিক্রমে একটি জাল হাদিস। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ﷀ বলেন: "কিছু সংখ্যক মানুষ যারা বর্ণনা করে যে, রাসূল ﷺ তাবুক যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে বলেছেন 'আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছি' এ হাদিসের কোন ভিত্তি নেই এবং যারা রাসূল ﷺ এর কথা ও কাজ অর্থাৎ হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন তারা কেউ এ হাদিসটি বর্ণনা করেন নি। কুফফারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই সবচেয়ে বড় আমল এবং মানুষ যত নফল ইবাদত করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হলো জিহাদ।" [মাজমু আল-ফাতওয়া] তাছাড়া ইবনে হাজার আসকালানী ﷀ বলেন: "এটা লোকমুখে প্রচলিত বিখ্যাত কথা। এটা ইব্রাহীম ইবনে আবি আবলাহ এর কথা, কোন হাদিস নয়।" [তাসদীদুল কাউস]

শেষ কথা

বস্তুত, তাদের এই সম্পূর্ণ কিতাবই এরকম নির্লজ্জ মিথ্যাচারে ভরপুর। আমরা এখানে তাদের প্রতিটি মিথ্যাচারে চুলচেরা বিশ্লেষণে যাই নি, কারণ উপরে তাদের নির্লজ্জ মিথ্যাচার প্রকাশ করা হয়েছে তারপরও যদি কারও তাদের কপটতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে তাহলে, সেই সন্দেহ দূর করার ক্ষমতা হৃদয়ের নিয়ন্ত্রণকারী আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। তদুপরি আবু হুরায়রাহ ﵁ এর হাতে পাকড়াও হয়ে ইবলিশ শয়তান যেমন একবার সত্য কথা বলেছিল এবং রাসূল ﷺ বলেছিলেন: "সে সত্য বলেছে, যদিও সে মিথ্যাবাদী" [আন-নাসাই] ঠিক তেমনি তাগূতের দালালরা তাদের কিতাবে একটি সত্য কথা বলেছে। তারা বলেছে: *"হুদুদের অপরাধ প্রমাণিত হলে কোন সরকার, শাসনকর্তা বা বিচারক কাউকেই শাস্তি লঘু বা গুরুতর করার কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হুদুদের বিষয়ে সুপারিশ করা ও তা আমলে নেয়া উভয়েই অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। হুদুদের শাস্তি সাংঘাতিকভাবে আমলযোগ্য এবং এগুলো প্রয়োগের আইনও অমার্জনীয়। অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তা পরিবর্তন বা লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকার লাভ করে না।"* [পৃষ্ঠা ৬২]

তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করার অধিকার কারও নেই, আল্লাহর দেয়া শাস্তি কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। তাহলে আমাদের প্রশ্ন হলো, বাংলার সরকার আর আদালতকে সেই অধিকার কে প্রদান করেছে? তারা কি আল্লাহর কাছ থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়েছে নাকি আল্লাহ তাদের বিশেষ ছাড় প্রদান করেছেন? বস্তুতঃ তারা আল্লাহর অধিকারে নিজেদের অংশ নির্ধারণ করেছে। কারণ বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর বিধান মান্য করা এবং তা প্রতিষ্ঠিত রাখা ইবাদত। আর এই ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা একমাত্র সর্বজ্ঞানী আল্লাহর। তারা বিধান পরিবর্তন করে নিজেদের মাবুদের জায়গায় অধিষ্ঠিত করেছে, আর এ কারণেই তারা তাগূত, আর তাওহীদের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান সম্পন্ন কেউই এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করে না।

পরিশেষে, আমরা বলবো, তাগূত মুরতাদদের ব্যাপারে আমাদের একটি মূলনীতি মনে রাখা উচিৎ আর তাহলো "তাদের মিথ্যাচারের কোন সীমা নেই এবং তারা মিথ্যা বলতে কোন কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধও করে না।" তাই মুমিনদের অবশ্যই উচিৎ সর্বদা তাদের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা। তাদের কোন কথাই যাচাই না করে গ্রহণ না

করা। এবং তাদের সাথে সব ধরণের সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তাগূতের গোলামদের সাথে শত্রুতা পোষণ করতে হবে, এমনটি যদিও তারা আমাদের পরিবারের কেউ হয় বা আমাদের বাবা-ভাইদের একজন হয়। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের প্রত্যাখ্যান করা ঈমানের শর্ত। আর এটাই আমাদের পিতা, মুসলিমদের জাতির পিতা ইব্রাহীম عليه السلام এবং সকল নবী-রাসূলতদের মিল্লাত।

আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে তাঁরই জন্য মুখলিস ইবাদত হিসেবে কবুল করুন, এই কিতাবকে অনেকের জন্য হিদায়াতের মাধ্যম বানিয়ে দিন এবং আমাদের জন্য নাজাতের উৎসে পরিণত করুন। হে আল্লাহ! হে মেঘমালাকে স্থানান্তরকারি! হে কাফির-মুশরিকদের একাই নিজের ক্ষমতার বলে পরাভূতকারী! হে আসমান-জমিনের মহাপ্রবল শক্তিধর মালিক, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। বাংলার জমিনকে জিহাদের ঘাঁটিতে আর তাগূতের কবরে পরিণত করুন। আমাদের মুজাহিদ ভাইদের সাহায্য করুন এবং তাদের নিরাপত্তা দান করুন। তাদের হাতে বিজয় দান করুন এবং তাদের জন্য মুমিনদের হৃদয়কে খুলে দিন। সর্বোপরি, বাংলার জমিনে খিলাফতের পতাকাকে উড্ডীন করে দিন যাতে এই অধিবাসীরা আপনার শরীয়তের সুশীতল ছায়াতলে ঈমান নিয়ে বসবাস করতে পারে। আর আমাদের সর্বশেষ আহ্বান: সকল প্রশংসা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের।